আবেগ ও অন্তর

গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস

আবেগ ও অন্তর

গবেষণমূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

একুশশতক

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ABEG O ANTAR
A Book of Articles on Emotion (Research & Analysis)
Writer : Dr. Tapan Kumar Biswas
Website: drtapankumarbiswas.com
Mobile : 9433125195
email: drtpan24pgs@gmail.com
Price : Rs 430.00 only

আবেগ ও অন্তর
গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন
লেখক : ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস
গ্রন্থস্বত্ব : ডাঃ দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা : ৭০০১২৪
প্রচ্ছদ : প্রীতম কাঞ্জিলাল
প্রকাশক
একুশ শতক
সুমিত্রা কুণ্ডু
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
প্রথম প্রকাশ
২৬শে অক্টোবর ২০২০
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন তথ্য কোনভাবেই সংরক্ষণ, প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ISBN: 978-93-5408-818-6
মূল্য :৪৩০ টাকা
প্রাপ্তিস্থানঃ
একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৭৩
আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত
প্রিন্ট ও বুকস, ৩৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৭০০০৭৩

উৎসর্গ

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে
সমগ্র বিশ্বে যে সকল ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসাকর্মী
প্রাণ হারিয়েছেন
এবং
বিশিষ্ট চিকিৎসক চিন্তাবিদ ও লেখক
ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস
যিনি আমাকে এই গ্রন্থটি প্রকাশনায়
উৎসাহ জুগিয়েছেন।

ভূমিকা

'আবেগ ও অন্তর' ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন। গ্রন্থটি তার এক ভিন্নধর্মী প্রকাশনা। ইতিমধ্যে তার লেখা 'ফিরে আসা', 'জেগে আছি', 'জনারণ্যে পদাতিক', 'রঙিন কাঁচঘর' ও 'অদম্য' এই কাব্যগ্রন্থগুলি এবং 'মিশর- মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে লেখক 'আবেগ ও অন্তর' গ্রন্থখানির নামকরণ করেছিলেন 'অন্তর অন্দর'। পরবর্তীতে নামকরণ করেন 'আবেগ ও অন্তর'।

এমন সময়ে এই 'আবেগ ও অন্তর' গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে যখন সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিপর্যস্ত- দিশেহারা। ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা মানব সভ্যতাকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারছে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সমগ্র বিশ্বে বহু চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন প্রতিদিন।

এটাও বোঝা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেই মানুষকে বাঁচতে হবে। মানুষের জীবনযাত্রায় এক বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনেক ঝুঁকি নিয়েই এমনি এক মহাদুর্যোগে ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস প্রকাশ করছেন তার অন্যতম গবেষণাগ্রন্থ 'আবেগ ও অন্তর'।

লকডাউন এবং আইসোলেসনের মধ্যে প্রকাশকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সে জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস প্রায় পাঁচ বছর ধরে 'আবেগ ও অন্তর' গ্রন্থখানি লিখছেন। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের আবেগ ও তৎসম্পর্কিত মানবিক আচার আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সে সম্পর্কে তার বিশদ উপস্থাপন রয়েছে এই গ্রন্থখানিতে। আশা করা যায় পাঠক এই গ্রন্থটির মধ্যে ভাবনা ও বিতর্কের নতুন উপাদান খুঁজে পাবেন।

সরোজ পার্ক, বারাসাত,
কলকাতা-৭০০১২৪

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি (দিল্লী)

রাজ্য সভাপতি (২০১৮-২০১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি।

সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত।

প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা।

প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল।

প্রাক্তন সম্পাদক, ইয়োর হেলথ,সর্বভারতীয় স্বাস্থ্যপত্রিকা-আই এম এ।

আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি।

আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স।

প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি।

প্রাক্তন সভাপতি, ব্যবসায়ি সমিতি, টাকি রোড, বারাসাত।

লেখকের গ্রন্থ সমূহ-

কাব্যগ্রন্থ-

ফিরে আসা

জেগে আছি

জনারণ্যে পদাতিক

রঙিন কাঁচঘর

অদম্য

ভ্রমণকাহিনী-

মিশর- মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে

গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলন-

আবেগ ও অন্তর

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক, দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবী, সুলেখক এবং সুবক্তা। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা

'ইওর হেলথ'-এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এর 'নিউজ ম্যাগাজিন' এ নিয়মিত লেখেন।

তাঁর ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস। তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর লেখা 'ফিরে আসা', 'জেগে আছি' 'জনারণ্যে পদাতিক' ও 'রঙিন কাঁচঘর' ও 'অদম্য' কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের তৈরি করেছে। মিশর ভ্রমণ নিয়ে তাঁর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারি গ্রন্থ 'মিশর- মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে।' এই গ্রন্থখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সব রয়েছে গ্রন্থখানিতে।

লেখকের বর্তমান প্রকাশনা 'আবেগ ও অন্তর' একটি প্রবন্ধসংকলন, তাঁর অন্যতম একটি সংযোজন। কয়েক বছর ধরে মানুষের আবেগ নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করেছেন গভীর ভাবে। ব্যক্তি ও সমাজে মানুষের আবেগের উৎপত্তি ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন দীর্ঘ দিন। তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান উপস্থাপন করেছেন এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থখানি লিখতে সময় নিয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর।

তিনি একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্য, বড়ো বড়ো শহর ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক, পেশাগত কারণে ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।

বিশ্বভ্রমণে তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, তার মধ্যে মিশর, রাশিয়া, চিন, ইউরোপের - গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ভ্যাটিকান সিটি, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, হংকং, উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ওমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশের মানুষের আবেগ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এক পাত্রে রেখে, খুঁজেছেন সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য। কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণের সময়। তিনি লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, সেন্টপিটার্সবার্গ, জেনেভা, রোম, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পিসা, তাসখন্দ, বেজিং, সাংহাই, হংকং, ম্যাকাউ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, কলোম্বো, কুয়ালালামপুর, মাস্কাট সহ আরও অনেক শহরে গিয়েছেন, অবস্থান করেছেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন আর এই গ্রন্থখানির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে আমেরিকা ভ্রমণের জন্য দশ বছরের ভিসা প্রদান করেন। সস্ত্রীক আমেরিকা যাত্রার আয়োজন করেও করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী প্রকোপের কারণে শেষ মুহূর্তে তাঁর ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি ভ্রমণ বাতিল হয়।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বাগডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শ্রী হরিদাস বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁর বাবা ছিলেন যশোর জিলা পরিষদের একজন সরকারি কর্মচারী। সমাজসেবি ও পরোপকারি মানুষ হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। সমাজে তাঁর অবদানের কথা এখনও মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস তাঁর বাবার আদর্শে বড় হয়েছেন শৈশবকাল থেকেই। তাঁর মা শ্রীমতি নিশারানী বিশ্বাস ২০২০ সালের ১৪ই মার্চ পরলোক গমন করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তাঁর মা ছিলেন তাঁর পরিবারের অভিভাবক ও তাঁর দার্শনিক।

ডাঃ দীপালীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রী ডাঃ দীপালী বিশ্বাস তাঁর সকল কর্মপ্রেরণার উৎস সকল সময়েই। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজেশ বিশ্বাস বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে কর্মরত আছেন। কনিষ্ঠপুত্র মুকেশ বিশ্বাস আইআইটির এমটেক ইঞ্জিনিয়ার। একজন কন্সালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ইউরোপে কর্মরত ও গবেষণারত আছেন।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজসেবার সঙ্গে বরাবর জড়িত। সদালাপী ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস একজন জনদরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত। অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য সমাজে সকলের নিকট তাঁর আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে।

তিনি সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত। শাখাস্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে আই এম এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি মানুষের রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। তিনি দেশের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন আর স্বাস্থ্যসচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রেখেছেন। তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবীকে সঙ্গে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

করোনা অতিমারির সময়ে তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করছেন। এই দুঃসময়ে দুঃস্থ প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি আই এম এ বারাসাত শাখায় বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে

প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান করোনা ভাইরাস আক্রমণের সময়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে গরিব মানুষের মধ্যে অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করছেন। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এ সময়ে মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক রোগীর চিকিৎসা করছেন। তাঁর রোগীদের টেলিমেডিসিন ও হোয়াটসঅ্যাপের সাহায্যে পরিষেবা প্রদান করছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাজ ও পরিশ্রম করে চলেছেন নিরন্তর।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

আবেগ ১১

সুখ ৩৭

দুঃখ ৫০

আতঙ্ক ৬০

বিতৃষ্ণা ৬৯

বিস্ময় ৭৬

অহংকার ৮৬

হিংসা ৯৯

ক্রোধ ১০৬

আকাঙ্ক্ষা ১০৭

অবিশ্বাস ১২৪

অনিশ্চয়তা ১৪২

আবেগ
(Emotion)

আমি মানুষকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছি দীর্ঘ সময় ধরে। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলেছি, আন্তরিক ভাবে মিশেছি। মানুষের আবেগ নিয়ে অনেক ভাবে ভাবছি দীর্ঘ দিন ধরে। তাদের আবেগের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ভাবে- বিভিন্ন পদ্ধতিতে। তাদের আবেগকে নিজের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। তাদের মনের আনন্দ আর কষ্টকে নিজের অনুভূতির পাশে রেখেছি আর বোঝার চেষ্টা করেছি মানুষের আবেগ কি, সুখ কি, দুঃখ কি, ক্রোধ কি, হিংসা কি—এইসব আবেগ অনুভূতি নিয়ে প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। যে সকল আবেগ সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ তাদের প্রতিটি মুহুর্ত অতিবাহিত করছে , আমরা চোখে দেখি না অনুভব করি মাত্র।

১৯৪০ সালে ফরাসি চিন্তাবিদ জাঁ পল সাত্রে একবার সিমোন বোভোঁয়ারের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে লিখেছিলেন, 'আমি অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সততা আর নীতিকে সমাজে প্রয়োগ করতে হলে আমার বর্তমান পরিস্থিতির দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হবে। সেটা শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে থাকলে হবে না। আমার কর্মের দ্বারাই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হবে- এটাই রীতি। অন্য কিছু যদি ভাবি তবে তা হবে আত্মপ্রতারণা, শঠতা ও জীবন থেকে পলায়নের নামান্তর।' তিনি এ ভাবেই জীবনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর এই কথাগুলো আমিও বিশ্লেষণ করেছি, অনুধাবন করেছি মর্মে মর্মে। আমার কর্মের দ্বারা আমার জীবন নির্ধারিত হবে। আর আমার কর্মের ধারায় প্রভাব থাকবে অবশ্যই আমার আবেগের। আবেগ বহির্ভূত কর্মকে মানুষের কর্ম বলা যাবে না। আবেগ বর্জিত কর্ম হচ্ছে গোরুর গাড়ি টানার মত। গোরু গাড়ি টানে সেখানে তার কোন দর্শন কাজ করে না। আর মানুষের সকল কাজেই থাকে তার দর্শন অথবা তার আবেগ।

আমরা কেউ অন্য কারো আবেগ পুরোপুরি বুঝতে পারিনা, হয়ত সামান্য কিছু স্পর্শ করতে পারি মাত্র- বাকি সবই অধরা থেকে যায়। আমি অনুসন্ধান করতে চেয়েছি প্রতিটি মানুষের গভীরে যে একটা রাজমহল আছে, সে রাজমহলের যে একটা অন্তঃপুর আছে সেটা। রহস্যময় সে অন্তঃপুর।

আমি চেষ্টা করেছি মানুষের সেই রহস্যময় অন্তঃপুর ঘুরে দেখতে। বহু বছর ধরে আলাদা আলাদা মানুষকে প্রশ্ন করেছি আবার দুটি ভিন্ন মানুষের বলা ও না বলা কথাগুলোকে এক টেবিলে রেখে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি কোথায় মিল, কোথায় অমিল, কোথায় উৎস আবার কোথায় বা হারিয়ে যায় আবেগ আর অনুভূতি।

নিজের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে মানুষের চালিকা শক্তি কি? কে বা কারা চালনা করছে মানুষকে? কোথায় তার উৎপত্তি? কি তার ক্ষমতা? কি তার কর্ম পদ্ধতি?

একটা অনুসন্ধানী মন আমাকে ভিতর থেকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছে এসব বিশ্লেষণে আর আমি উত্তর খুঁজেছি প্রতিনিয়ত। আবেগ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার অনেক দিনের। আমার দীর্ঘ নিবিড় পর্যবেক্ষণে এটা বুঝেছি যে আবেগই মানুষকে পরিচালনা করছে। মানুষের আবেগ বিশ্ব পরিচালনা করছেও বলা চলে। বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করেছি, 'আবেগ থেকে কি চিন্তার উৎপত্তি? নাকি চিন্তা থেকে আবেগের উৎপত্তি?' অথবা 'আবেগ থেকে কি কর্মের উৎপত্তি? নাকি কর্ম থেকে আবেগের উৎপত্তি?' এসব নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেছি, একা একা ভেবেছি আবেগ আর চিন্তার রসায়ন নিয়ে। মানুষের মধ্যে থেকেই ভেবেছি আর অন্তরদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি তাদের অন্তরের অন্দরে।

অনেক সত্য সহজে মিলেছে, অনেক অভিজ্ঞতা সহজেই অর্জন করেছি। অনেক সময়েই আমি কিছু ধারণায় উপনীত হতে পেরেছি, তাদের অন্তরের একটা ঠিকানায় পৌঁছতে পেরেছি।

আবেগ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে কেন গেলাম সে প্রশ্ন আসবেই। আমার কয়েকজন বন্ধুদের যখন বললাম যে মানুষের আবেগ, অভিজ্ঞতা আর ব্যবহার নিয়ে একটা কিছু লিখব এবার। তারা বলল, 'তুমি মনঃস্তত্ব আর মনোবিদদের পরিসরে ঢুকে যাচ্ছ? সাহস তো মন্দ নয়।' আমি ওদের আশ্বস্ত করে বলেছি, 'না বন্ধু, আমি কারও কোন পরিসরে ঢুকছি না । মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কারো ক্ষেত্রেই আমি প্রবেশ করছি না। আমি আছি আমাতেই। আমার লেখনীর নিজস্ব একটা স্বচ্ছ জগত আছে।'

আসলে কেউ যখন কলম ধরে সে তার নিজের বিচরণ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বিহার করার স্বাধীনতা ভোগ করে। নিজের কলম নিয়ে কেউ অন্যের মরুভূমি বা মরূদ্যানে প্রবেশ করে না। কলমের স্বাধীনতা শুধু কলমের মালিকের নিজের সাম্রাজ্যে। অন্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সে তখন এক অনুপ্রবেশকারীর মতই দুর্বল আত্মগোপনকারী লেখক।আমি অন্তত অনুপ্রবেশকারী হতে চাই না।

আমারও একটা সাম্রাজ্য আছে অন্যের মত। অন্য লেখকদের মত আমিও তাই গর্ব করে বলি, 'আমি যা লিখছি সে তো আমারই ধন, আমারই রাজমহল।

আমারই স্বরচিত বাগান। সে বাগানের চারিদিকে কোন প্রাচীর নেই। সকলের জন্য অবাধ প্রবেশাধিকার। যে কেউ আসবে, আমার বাগানে বসবে, গল্প করবে, ফুলের গন্ধ নেবে। আবার যার যার সময় হলে ফিরে যাবে তার নিজের আলয়ে। রেখে যাবে কিছু সুখ স্মৃতি। সেটাই আমার লভ্যাংশ, আমার পাওনা গণ্ডা। এই প্রবন্ধগুলো পড়ে আমার আদরের পাঠক যা কিছু আলোচনা, সমালোচনা রেখে যাবেন সেটাই হবে আমার ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সম্ভাবনা। আগামি দিনের লেখার উপাদান।'এতেই আমার আনন্দ। লেখা তো মূলত লেখকের নিজের আনন্দের জন্য। আর যদি পাঠক উপকৃত হন বা কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক পান তাহলে সার্থক আমার পরিশ্রম।

আমি চাই আমার এ 'আবেগ ও অন্তর' গ্রন্থখানি পাঠক পড়ুক, সমালোচনা করুক, বিতর্কে মেতে উঠুক এবং নতুন কিছু বলুক যা আমার চিন্তার সঙ্গে একেবারেই হয়ত মেলে না। অথবা যদি তারা সহমত হন সেটাও বলুক, তবেই না ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হবে, পাঠকের সমালোচনা আর বিতর্কেই আমার লেখা জল পাবে, মাটি পাবে, আলো পাবে। সমালোচনা হলে বুঝব আমার লেখা সবটাই তারা পড়েছেন। এটা তো ঠিক পুরো গ্রন্থখানি না পড়ে তো কেউ সমালোচনা করতে সাহস পাবেন না। সেখানেই আমার আনন্দ। আর এভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত নতুন তথ্য দেবে আমার ভাবনার ভিত্তিতে অথবা আমার ভাবনা নস্যাৎ করে আমার চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে নতুন কথা বলবে।

আমি লিখব নিজের ভাবনা ও তথ্য প্রকাশের জন্য। তারপর তো সমালোচকরা আছেই। মন্দকে মন্দ বলবে, ভালোকে ভালো বলবে। আমি বন্ধুদের আশ্বস্ত করেছি, 'আমি ওঁদের গণ্ডিতেও আসা যাওয়া করব হয়ত। সে তো সকলেই করে অল্প বিস্তর। ভাবনার সীমারেখা কেউ টানতে পারে না।

কিন্তু আমি কারও এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকব না। আমি থাকব আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে, আর লিখব আমার দায়িত্ববোধ থেকে। কারণ এ সমাজকেও আমার কিছু দেওয়ার আছে, যেমন প্রতিটি মানুষেরই জন্ম হয় এ সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য।

প্রতিটি মানুষের জন্ম পৃথিবীকে কিছু দেওয়ার অঙ্গীকারে। আমিও দায়বদ্ধ। আমি নিজে যথেষ্ট আস্থাশীল যে আমার লেখা এ গ্রন্থটি পাঠ করে সকলেরই পরিচ্ছন্ন ধারনা জন্মাবে যে এখানে আমি আমার যে মত ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছি সেখানে সরাসরি মানুষের ছোঁয়া ছিল। মানুষকে স্পর্শ করেই আমি তাদের কথা লিখেছি। তর্ক বিতর্ক, সে তো পাঠকের স্বাধীনতা।

আমার মনে হয়েছে আবেগ মনের মধ্যে জাগরূক অথবা সুপ্ত যে কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে এবং চিন্তা আবেগ থেকেই তৈরি হবে। আবেগই গড়ে

দেবে চিন্তা করার ভিত। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে আসবে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও প্রয়োগ এবং ঝুঁকি। এরপর কাজের মুল্যায়ন ও লাভ ক্ষতি। এই চক্র চলতে থাকে মানুষের জীবনে।

আমার উপলব্ধি হয়েছে যে মানুষ এক জায়গায় স্থির নেই। মানুষ ক্রমেই নিজেকে ভাঙে। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙে ভেঙেই নিজেকে এক জীবনেই গড়ে নতুনরূপে। সে ভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙে নিজে নিজেই-নিজের নাগরিকদের দ্বারা। আর নতুন করে সেই সমাজের গর্ভে নতুন একটা সমাজ গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে উন্নত সমাজ। রাষ্ট্রের পুরনো কাঠামোয় জন্ম হয় নতুন উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থার। মানুষ নিজের স্বত্বাকে নিজেই ভাঙে ও নিজেই আবার নিজের স্বত্বা গড়ে। এখানে নিয়ন্ত্রক হচ্ছে যুক্তি আর অভিজ্ঞতা। প্রাচীনপন্থীরা যতই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকার কথা বলে চিৎকার করুক, দেশ সমাজ পরিবর্তিত হবেই সময়ের আশ্রয়ে, প্রয়োজনের তাগিদে। আমি বরাবর পরিবর্তনবাদী ।

মনীষী দেকার্ত বলেছেন, 'মন ও বস্তুর বিরোধ চিরকালীন। এই দুইয়ের বিরোধ থেকেই জন্ম দুটি পরস্পর বিরোধী নীতি-যুক্তিবাদ আর অভিজ্ঞতাবাদ।' আবেগ কখনই যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। জ্ঞানের উৎস যুক্তি। শক্তির উৎস অভিজ্ঞতা। মন ও বস্তুর বিরোধে মধ্যস্ততার ভূমিকা নেয় আবেগ। যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা মনকেই মনে করেছেন প্রধানতম বিষয়। তারা সজোরে উপেক্ষা করেছেন অভিজ্ঞতাকে। তাদের ধারণা, যুক্তিই আলো দেখায়। সেই আলোতেই মানুষ বাইরের জগৎ দেখে। তারপরই তো আসবে অভিজ্ঞতা।

সেজন্য আবেগই প্রথম, আবেগই শক্তির জন্মদাতা। কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতাবাদীরা তবু ঝগড়া করে চলেছেন এই বলে যে, অভিজ্ঞতা না হলে কখনই মানুষ জ্ঞানের দরজায় পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং অভিজ্ঞতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি এটা মানতে রাজি নই। আমার মত-আবেগই চালক, আবেগই সর্বাগ্রে। আবেগ মানুষকে পৌঁছে দেবে অভিজ্ঞতার দরজায়। অভিজ্ঞতা আবেগের উত্তরাধিকার।

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখেছি গোড়া থেকে সারা বিশ্বের পণ্ডিতেরা দ্বিধা বিভক্ত যে চিন্তা আগে না আবেগ আগে। চিন্তা ও আবেগের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকরা হয়েছে। সেই পুরাতন দ্বন্দ্বের মতো-মুরগি আগে না ডিম আগে? এই দ্বন্দ্বে চিন্তাবিদেরাও দ্বিধা বিভক্ত। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সমাধানের আশায়, সহমতের আশায়।

এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করছি যেগুলোর উত্তর আমি সন্ধান করার চেষ্টা করেছি। কিছু প্রশ্ন করলে আর তাদের উত্তর ও অনেক চিত্র মানসপটে উঠে আসবে—

- সামনে বড়ো বিপদ বুঝেও একজন মানুষ সতর্ক হল না কেন?

- একজন মানুষ একটি মহা আনন্দ সংবাদ পেয়েও আনন্দে আত্মহারা হল না কেন?
- একজন মানুষ অতি সামান্য দুঃসংবাদ পেয়ে কেন আর্তনাদ করতে লাগল?
- একজন মানুষ নিকটজনের দুঃসংবাদ পেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল কেন?
- একজন মানুষ অতি সামান্য আনন্দ সংবাদ পেয়ে বন্ধুদের ডেকে পার্টির আয়োজন করল কেন?
- একজন মানুষ শত্রুর খারাপ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল কেন?
- একজন মানুষ তার কোন ক্ষতি হলেই অন্য কাউকে দোষারোপ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন?
- একজন মানুষ তার কোন সমস্যা হলেই প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ওঠে এবং অন্যের কোন ক্ষতি না করা পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না?
- আর অন্য একজন মানুষ বিপদ বা আনন্দসংবাদ কোনটিতেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না কেন? উদাসীন থাকল কেন?

এক একটি ক্ষেত্রে এ সকল প্রশ্ন যেমন পাঠকের মনেও উদয় হয় তেমন আমারও মনে উদয় হয়েছে। হাজারও প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা নিজে নিজেই হচ্ছি আর নিজে নিজেই তার উত্তর খুঁজছি এবং নিজেকেই উত্তর দিচ্ছি। পাশের মানুষ জানতেও পারে না প্রতিটি মানুষের মনে প্রতিক্ষণে কি লক্ষ কথা ঘুরপাক খায় আর নিজেই উত্তর সে খোঁজে। অনেক প্রশ্ন আর তার উত্তর অনেকটাই জড়িয়ে আছে একটি স্থানে -তা হল আবেগ।

কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন আচার আচরণ, ব্যবহার সবই আবর্তিত হচ্ছে তার আবেগ ঘিরে। মানুষের আবেগ কখনও দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনও বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী। সেজন্যই মানুষ নিজেকেও চিনতে পারে না অনেক সময়। বিশ্লেষণ করতে পারে না অনেক ঘটনা। বিশ্লেষণ করতে পারে না নিজের আচরণ।

মানুষ নিজেই বলে ওঠে, 'আমি এমন কাজ করতে পারলাম! এমন কুচিন্তা আমার মাথায় আসতে পারল!' সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অনেক ক্ষেত্রেই। আবার অতি সক্রিয়তার অভিযোগও উঠে আসে, যে প্রতিক্রিয়া একেবারেই প্রয়োজন ছিল না।

পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই তাদের জীবদ্দশায় কোন এক সময়ে বলেছেন, 'আমার এমন কাজ করা উচিত হয়নি', যখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী নিজের মনের কোনে বসবাস করছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই কোন না কোন ভুল জীবনের কোন না কোন সময় করেছেন আর সে কৈফিয়ত নিজেই নিজেকে দিয়ে থাকেন।

আবেগ শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত একটি সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থা যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ব্যবহারিক স্পন্দন, আনন্দ অথবা

দুঃখ নয়তো বিতৃষ্ণা। এটা নিয়ে কোন পণ্ডিতই সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। কোন মনোবিদ সঠিক সংজ্ঞাও দিতে পারেননি আজ পর্যন্ত। এক এক পর্যবেক্ষক এক এক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক মনোবিদ তার নিজের মত করে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর অন্যজনে তার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সকলেই এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, মানুষের মনের এই অবস্থান আজও রহস্যই রয়ে গেছে। এখনও চলছে গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় অনুসন্ধান। এ রহস্য অনুসন্ধান চলতেই থাকবে যতক্ষণ উত্তর না মিলছে।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় সাতশো সত্তর কোটি। অর্থাৎ সাতশো সত্তর কোটি মন। কিন্তু আবেগ সাতশো সত্তর কোটি নয়। সাতশো সত্তর কোটি আবেগ বললে ভুল হবে। অনেক হাজার গুনে বেশি। সাতশো সত্তর কোটি মন সেও তো এক জায়গায় স্থির নেই, ক্ষণে ক্ষণে বদল করছে আবেগের চরিত্র। আমরা ফুটেছি মানুষের মনের পেছনে, আর দেখতে চাইছি, বুঝতে চাইছি, 'আবেগ কি, কেন, কেমন আর কোথায়? কেন এমনটা হয়? মন কেন এমন করে?'

আমি ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি আর জানতে চেয়েছি তাদের আবেগের উৎস, ধরণ, প্রতিক্রিয়া এবং তার প্রকাশভঙ্গি। প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করেছি তাদের আবেগময় আচরণ আর বক্তব্য। এর জন্য আমি সময় নিয়ে কথা বলেছি তাদের সঙ্গে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। চেম্বারে রোগী দেখার সময় রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের সঙ্গে আসা আত্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছি। আর ভাব জমিয়ে তাদের ও তাদের সংসারের কথা, তাদের বাড়ির কথা শুনেছি, আর লক্ষ্য করেছি তাদের প্রতিক্রিয়ার ধরণ।কত মানুষ তাদের বাড়িতে কলে নিয়ে গেছে রোগী দেখাতে। রোগী দেখার পর বেশ কিছুটা সময় থেকেছি সে বাড়িতে। ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করেছি। তারা চা খাইয়েছে এবং চায়ের ফাঁকে তাদের সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনেছি, এমনকি রাজনীতি- সমাজনীতির বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছি। এর মাঝ দিয়েই বেরিয়ে এসেছে তাদের আবেগ।

আমি অবাক হয়ে শুনেছি কত মানুষের কত ধরনের আবেগ থাকতে পারে। আমি ভেবেছি, 'মানুষের মনে এমন কথার আবির্ভাব হতে পারে?'

তাদেরকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মত করে দেখেছি, বিশ্লেষণ করেছি, একই সঙ্গে অন্য সকল বিশিষ্ট পণ্ডিতদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়েছি একান্তে বসে।

গত দুই দশক ধরে সারা বিশ্বে আবেগ নিয়ে যত গবেষণা চলেছে আর কোন কিছু নিয়ে এত গবেষণা হয়নি। মনঃস্তত্ত্ব, স্নায়ুবিদ্যা, এন্ডোক্রিনোলজি,

চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইতিহাসবিদ্যা, যৌনতা, সমাজবিদ্যা, কম্পুটার সায়েন্স এ সকল বিভাগের পণ্ডিতেরা সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, 'আবেগ কি, কোথায় আর কেমন?' পণ্ডিতেরা সহমত হতে পারেননি আবেগের অনেক বিষয়েই। বিশ্বের বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের এই বিরাজমান মতপার্থক্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি, যা আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে আরও কয়েক গুন।

পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেন কিন্তু একসময়ে দেখা যায় তাদের গবেষণার ফলাফল একটা জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে কেউ কারও সঙ্গে মিলতে পারছেন না, মেলাতে পারছেন না তাদের পর্যবেক্ষণ আর অনুসন্ধানের ফলাফল। সকলেই দেখছেন তাদের নিজের চোখে, প্রকাশ করছেন তাদের ফলাফল। এভাবে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক তাদের প্রাপ্য তথ্য প্রকাশ করছেন এবং অপেক্ষা করছেন অন্য কারও সঙ্গে মিলিয়ে নেবার।

আমিও আমার এই গ্রন্থে আমার পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করছি আর একই সঙ্গে অন্য সকল পণ্ডিত ও বিশেযজ্ঞদের তথ্যের সঙ্গে মেলাচ্ছি। একদিন হয়ত দেখব সকলেরই বিশ্লেষণের একটা মূল সুত্র রয়েছে। যেমন বহু ক্ষেত্রে বহু অজানা রহস্য সন্ধানে সমঝোতা হয়েছে বহু যুগে বহু দেশে।

সকলেই যার যার মতো করেই আবেগকে দেখতে পেয়েছেন। সকলেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে। তারা খোঁজার চেষ্টা করেছেন আবেগের উৎস। মানুষের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়া নিয়ে তথ্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমানে সকলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। কারণ এটা তো ঠিক যে মানুষের মনের বসবাস তো শরীরেই আর মানুষের মনের মধ্যে যেটাই ঘটুক তার উৎস তার মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কের কোযে এবং স্নায়ুর অভ্যন্তরে। মানুষের মস্তিষ্কের কোযে ও স্নায়ুর মধ্যে সংঘটিত হয়ে চলেছে রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা কিছু বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ ও তার তারতম্য। যা ঘটছে তার হদিশ পেতে আপাতত হয়ত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অতি সুক্ষ্ম ও অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলোর রহস্য উদঘাটন হবেই একদিন।

পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি স্ক্যান এবং ম্যাগনেটিক ইমেজিং রেজোনেন্স স্ক্যান এই দুটি অতি সুক্ষ পরীক্ষার দ্বারা মস্তিষ্কে আবেগের উৎপত্তি-স্থল ও তার ধরণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমিও আমার মত করেই পর্যবেক্ষণ করেছি ও নিজের মত করেই ব্যাখ্যা করেছি। আমি আশাবাদী একদিন আবেগের সকল রহস্য উদঘাটন হবে। তখন হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে না আমাদের। কারণ মানুষের আবেগই সবার আগে মানুষকে প্রভাবিত করে ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাড়িত করে।

আবেগকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন আবেগ হচ্ছে মানুষের অগ্রগামী উদ্দীপনা (Positive Thrive) এবং পশ্চাদগামী অভিঘাত (Negative Thrive)। এক ধরনের শারীরবৃত্তীয় এবং একই সঙ্গে মানসিক আভিজাত্য। মানুষের মনের এই দু'টি অবস্থান মানুষকে একই সঙ্গে দিকনির্দেশনা দেয়। একটি অগ্রগামী অন্যটি পশ্চাদগামী। অগ্রগামী তাড়না মানুষকে কিছু করার জন্য উত্তেজিত করে, এটা তার আবেগের আভিজাত্য। যা ধনাত্বক প্রস্তুতি নিতে বলে। আর পশ্চাদগামী তাড়না কর্ম থেকে বিরত করে, এটা তার আবেগের দারিদ্র। তাকে ঋণাত্মক বা অসাড় অবস্থা বলে। এটা কোন ইচ্ছা থেকে মানুষকে সবসময় নিবৃত্ত করে। একই সঙ্গে দুটি আবেগ অবস্থান নেয় মানুষের মনে। একবার সে ভাবে কাজটি করি, সামনে এগোই। একই সঙ্গে ভাবে, 'না, কাজটি করা যাবে না, বা করব না বা করা ঠিক হবে না বা করে কি লাভ।' সবই নির্ধারিত হবে তার আবেগের গুনগত ও পরিমাণগত অবস্থার উপর। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ,

রাস্তায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন মানুষ আহত হয়েছে। তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষ। ওই দুর্ঘটনায় আহত মানুষটির প্রতি মানুষের আচরণ নির্ভর করবে পাশে চলে যাওয়া মানুষগুলোর তাৎক্ষণিক আবেগের উপর।

কি কি হতে পারে?-

১) একজন মানুষ আহত মানুষটিকে দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

২) একজন মানুষ আহত মানুষটির পাশে যাবে, দেখবে কিছুক্ষণ। তারপর চলে যাবে নির্বিকার।

৩) একজন মানুষ দেখবে, তাকে সাহায্য করতে চাইবে। আশেপাশের লোকজনকে ডাকবে। কেউ সাড়া দিল না। তখন সে লোকটিও আস্তে আস্তে সে স্থান ত্যাগ করবে।

৪) অন্য একজন তার পাশে যাবে, এদিক ওদিক তাকাবে তারপর আহত লোকটির পকেট থেকে তার মানিব্যাগ ও মূল্যবান সামগ্রি থাকলে নিয়ে চম্পট দেবে।

৫) পঞ্চম ব্যক্তিটি একাই কারও সাহায্য ছাড়াই আহত লোকটিকে নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে ও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে টাকাও খরচ করবে। সুস্থ করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

এখানে পাঁচ প্রকারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল পাঁচটি ভিন্ন মানুষের মধ্যে, অথচ ঘটনা বা প্রেক্ষাপট একটিই। এখানেই রহস্য। দুর্ঘটনায় আহত মানুষের সম্মুখে পাঁচ প্রকার আবেগের মানুষ এসে উপস্থিত হল এবং পাঁচ প্রকারের

প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হতে পারত। এখানে পলায়নি আবেগ, নির্বিকার আবেগ, চৌর্য আবেগ, সাহসী আবেগ এবং পরোপকারী আবেগ এই পাঁচটি আবেগ দেখা গেল। এখানে ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও নির্বিকার তিন প্রকার গুনবিশিষ্ট মানুষ পাওয়া গেল। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে একই মানুষ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে পাঁচটি ভিন্ন মানুষ পাঁচ রকমের প্রতিক্রিয়া দেখাল, শুধু তাই নয় একটি মানুষের মধ্যে শুধু সময়ের ব্যবধানে পাঁচ প্রকার আবেগ কাজ করতে পারে বা উদয় হতে পারে। দেখা গেছে দিনের শুরুতে সকালে একরকম আবেগনির্ভর আবার সন্ধ্যা বেলায় অন্যরকম আবেগ কাজ করতে পারে। একা থাকলে একরকম সঙ্গে লোকজন থাকলে ওই মানুষটির আচরণ অন্য রকম হতে পারে। একই মানুষ কখনও নির্বিকার কখনও অতি আবেগি পরোপকারী।

সময়ের ব্যবধান এজন্য বলছি, কারণ আমার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ হচ্ছে আবেগের আহ্নিক পরিবর্তন। সাধারণত ভোরে বা সকালের দিকে মানুষ স্বচ্ছ মন নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে। তখন তার মধ্যে একটা সুখের আবহ থাকে। অপরাধ করার প্রবৃত্তি থাকে না। বরং একটা পরোপকারী আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে। দিন যত গড়ায় ততই স্বার্থ চিন্তা সক্রিয় হয়। পৃথিবীতে যত অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তার বেশির ভাগ হয়েছে সন্ধ্যায় বা রাত্রে।

এটাই আবেগের অস্থিরতা। কেউ কেউ বলেন যে, আবেগ ধীর স্থির অচঞ্চল। তারা বলেন, আবেগ এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। বাহ্যিক যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় সেটা তার পরিবেশের প্রভাব। এই পরিবেশের প্রভাবে তার প্রতিক্রিয়ার সাময়িক পরিবর্তন হলেও তার আবেগ একই থাকে। আমি এটা মানি না। আবেগের গতি চিন্তার থেকে কম কিন্তু একেবারে অচঞ্চল নয়। চিন্তা যেমন দ্রুতগতিতে অবস্থান বদল করতে পারে আবেগ ততটা পারে না বা করে না ঠিকই কিন্তু অবস্থান বদল করে।

যেমন বারাসাতের বিমল একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার পর অপেক্ষা করছিল ফলাফলের। একদিন দুপুরে ইন্টারনেটে দেখল তার নাম ওঠেনি। স্বাভাবিক ভাবেই মন খারাপ করে দুঃখ ভারাক্রান্ত আবেগ নিয়ে বসে আছে বাড়িতে। এমন সময় তার বান্ধবী নুপুর তাকে ফোন করল এবং জানতে চাইল চাকরির খবর। বিমল তাকে জানাল যে তার চাকরি হয়নি। নুপুর তাকে প্রস্তাব করল, ‘চলো, কোথাও বেড়াতে যাই। মন ভালো হবে।’ নুপুরের কথায় সাড়া দিয়ে তখনই বিমল বেরিয়ে পড়তে পারে এবং কোন ক্লাব বা পার্কে বসে চুড়ান্ত আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। বাড়ি ফিরে সে আবারও দুঃখ

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করবে পরের দু'চারদিন। তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

অথবা বিমল মন খারাপের কারণে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে নুপুরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারে ও কিছুই না খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে কাটাতে পারে সারাদিন। এ ক্ষেত্রে কি হয়েছিল বিমলের? আবেগের কি কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় নি? হয়েছিল, আবেগ যে কোন দিকে মোড় নিতে পারে, নেয়ও। আবেগের ওঠানামা হয়ই, অবশ্যই হয়।

এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি যে আবেগ সাময়িক চঞ্চল হতে পারে, অবস্থান বদল করতে পারে। তবে হ্যাঁ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। কারণ আবেগই একটি মানুষের চরিত্র নিরূপণ করে, আবেগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বদল ঘটে। সাধু এভাবেই চোর হয় ভিতর থেকে, আবার ভিতর থেকেই চোর সাধু হয়, কোন ঢাকঢোল না পিটিয়েই। কারণ এ পরিবর্তন ঘটে ভিতর থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি অসৎ লোক ভালো কাজ করছে।

পারিপার্শ্বিক মানুষ সেটা আবিষ্কার করে কিছুদিন পরে। আর সকলে বলে ওঠে, 'আরে! দেখো দেখো, লোকটা ভালো হয়ে গেছে।' অথবা বলে উঠবে, 'আরে দেখো দেখো, এই ভালো মানুষটিও গোল্লায় গেছে, কি সব করে বেড়াচ্ছে আজকাল।'

সবই আবেগের খেলা বা কারসাজি। আর এটা ঘটে নিঃশব্দে নীরবে। রত্নাকর দস্যু এভাবেই হয়েছিলেন বাল্মীকি মুনি। আবেগের প্রভাবে।

মানুষের মনে ধনাত্মক ও ঋনাত্বক দুটি আবেগের একই সঙ্গে অবস্থান। এর মধ্যে যেটির প্রাবল্য সেটিই খেলায় জিতবে। এটাই আবেগের সুক্ষ্ম চাল যা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হচ্ছে—মস্তিষ্কের কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা বৈদ্যুতিক তারতম্য কি এটা খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে।

আবেগ মানুষের মধ্যে শারীরবৃত্তীয়, ব্যবহারিক ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় পরিবর্তন আনে এবং মানুষের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার শারীরিক ও মানসিক অবস্থান সৃষ্টি করে। সবসময়েই মানুষের আবেগ সক্রিয় থাকে। চিন্তা এবং আবেগ দুটোকে মিলিয়ে বা গুলিয়ে নিলে হবে না। চিন্তা সব সময়ে ক্রিয়াশীল থাকে না, কিন্তু একটি মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ তার আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে।

আবেগ মানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া করে। তার খাদ্যাভ্যাস, গঠন, বৃদ্ধি বা ক্ষয়ে প্রভাব ফেলে। কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মারাত্মক অবস্থান নিয়ে থাকে। স্নায়বিক রোগ, মনোরোগ এমনকি হজম প্রক্রিয়া,ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসারের মত রোগেও আবেগের প্রভাব পড়ে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজ হতে পারে—

অসিতবাবুর স্ত্রী তার বাপের বাড়ি গেছে কিছুদিনের জন্য। আজ কাজের মাসি আসেনি তাই রান্না হয়নি। অসিতবাবু রাস্তার মোড়ে কথাকলি রেস্টুরেন্টে গেলেন দুপুরবেলার আহারের জন্য। খাসির মাংস আর ভাত খেয়ে বিল মিটিয়ে বাড়ি এলেন এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। একটু গড়িয়ে নিতে বিছানায় ভাতঘুমে গেলেন। এমন সময়ে পাশের বাড়ির নন্দ এসে অসিতবাবুকে বলল, 'কাকু, আমি শুনে আসলাম যে কথাকলি রেস্টুরেন্টে নাকি খাসির মাংসের কথা বলে সকলকে আজ দুপুরে গোরুর মাংস খাইয়েছে।' এই কথা শুনে অসিতবাবুর তিনপ্রকার প্রতিক্রিয়া কাজ করতে পারে যা তার আবেগের উপর নির্ভর করবে।

যেমন-

১) অসিতবাবু ভাববেন রেস্টুরেন্টের ওরা হয়ত একটা ভুল করে ফেলেছে। কিই বা ক্ষতি হবে। পৃথিবীর কত মানুষই তো গোরুর মাংস খায় এবং এখানেই সে হয়ত থেমে থাকবে। আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না।

২) অসিতবাবু ভাববেন, আমাকে গোরুর মাংস খাওয়াল? জীবনে কোনদিন গোরুর মাংস খাইনি। তৎক্ষণাৎ তার শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। পেট ব্যথা শুরু হয়ে যেতে পারে, বমি শুরু হবে, পেট ফেঁপে যাবে। মাথা ঘুরতে থাকবে। মারাত্মক রকম অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে। শারীরিক দুর্বলতা থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৩) অসিতবাবু প্রচণ্ড রকম রেগে যেতে পারেন। ভাবতে পারেন যে তার জাত ধর্ম সব গেল। সবকিছু ফেলে তখনই ছুটতে পারেন কথাকলি রেস্টুরেন্টের দিকে। রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিতে পারেন। এর থেকে খুন খারাপিও হয়ে যেতে পারে। রেস্টুরেন্টে অগ্নি-সংযোগ ঘটাতে পারে লোকজন। এমনকি লোকজন জড়ো করে ধর্মীয় আবেগের কথা বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেঁধে যেতে পারে এলাকায়।

এই তিনটি অবস্থাই হতে পারে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার আবেগের অবস্থার উপর। তিন প্রকারের মানুষ এই তিন প্রকার আবেগ নিয়ে চলে ও তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখায়। আবার এমনও হয়- একটি মানুষেরই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে আবেগ পরিবর্তিত হয়। অসিতবাবুই তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন।

কোন কোন তত্ত্ব বলছে, আবেগের জন্য চেতনা একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মনে হবে, কোথায়, আমি তো কিছু ভাবছি না। সেটা যেমন আংশিক সত্য, তেমন ভাবে প্রতিটি ঘটনার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। মনের গভীর থেকে আবেগের প্রভাবে একটি চিন্তা কাজ করা শুরু করে।

এখানে পুরো ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটা পরপর সামঞ্জস্য কাজ করে।

যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, রাজীব ভাবল বা দেখল যে সে একটা বিপদের মধ্যে আছে বা কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আর তখনই তার শরীরের স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠবে তার বিপদ নামক পরিস্থিতির উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে। তার রক্তচাপ বেড়ে যাবে, নাড়ির গতি, হার্টবিট বেড়ে যাবে, শরীর ঘামতে শুরু করবে, চোয়াল শক্ত হয়ে যাবে, মাংসপেশিতে টান ধরবে।

এখন বিপদের আঁচ পেলে অথবা বিপদে পড়লে তার অবস্থা অনুযায়ী সে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। প্রাথমিক ভাবে নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনার আগেই শারীরিক বিক্রিয়া ও স্নায়বিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

যে কোন বিপদে তিন ভাবে সাড়া দেয় মানুষ-

- সাহসের সঙ্গে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেবে, তার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হবে।
- ভয়ে আতঙ্কে ভেঙ্গে পড়বে, অসুস্থ হয়ে পড়বে। বেশি বয়স্ক হলে এবং বেশি আবেগপ্রবণ হলে অসুস্থতা মারাত্মক হতে পারে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়।
- পলায়নের একটা প্রস্তুতি শুরু হবে। তখন তার মধ্যে পালানোর শক্তি তৈরি হবে মনে ও শরীরে।

এই যে একটি অবস্থানে তিন প্রকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম এটা তিন প্রকারের আবেগের কারণে।

আবেগ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। আবেগ আমাদের জীবনকে নানান ভাবে প্রভাবিত করে। অনেকে বলেন আবেগই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমারা যে কাজকর্ম করি, আমাদের যে সকল পছন্দ অপছন্দ সেগুলোও নিয়ন্ত্রণ করে আবেগ। সিদ্ধান্তের বেশির ভাগ নেওয়া হয় আবেগের দ্বারা, যদিও বলা হয়ে থাকে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, সেটা খুব কম সময়েই করা হয়। এমনকি বড়ো মনিষীরাও এটাই করেন। তাঁরাও তাঁদের জীবনের অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েই।

বিখ্যাত মনোবিদ পল একম্যান ১৯৭০ সালের দিকে বলেছিলেন যে ছয় প্রকার আবেগ রয়েছে যা মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে প্রভাব

বিস্তার করে-

- সুখ
- দুঃখ
- বিতৃষ্ণা
- ভয়
- বিস্ময়

- ক্রোধ

পরে তিনি অবশ্য অন্য আরও কিছু আবেগের বর্ণনা দিয়েছেন যেমনঃ

- গর্ব
- উত্তেজনা
- বিমূঢ়তা
- লজ্জা

আবেগের সংমিশ্রণ-

বিখ্যাত মনোবিদ রবার্ট প্লুটচিক বলেছেন দুই বা ততোধিক আবেগের সংমিশ্রণে অন্য একটি বিশেষ বিশেষ আবেগের সৃষ্টি হয়। তিনি এই অবস্থাকে আবেগের চক্ররূপে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এমনও হয় দুটি আবেগের একই সময়ে উপস্থিতির কারণে মনে অন্য এক জটিল আবেগ তৈরি হয়।

২০১৭ সালে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস একটা নিরীক্ষা চালায় মানুষের আবেগের উপর। তারা দেখেন আরও প্রায় ২৭ প্রকার আবেগ রয়েছে। এ সকল আবেগ মানুষের এক একটি অক্ষে অবস্থান নেয় ও মানুষের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে থাকে। সেগুলো গবেষকরা সব নথিবদ্ধ করেন ও প্রকাশ করেন।

আমার নিজের কিছু দেখা, কিছু ঘটনা বা কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি এবং তারপর বিশ্লেষণ করা যাবে,

আমি রোগীর বাড়ি থেকে ডাকলে কলে যাই রোগী দেখতে। সাধারণত সেই সকল বাড়ি থেকেই কলে নিতে আসে যে সকল বাড়ির রোগী আমার চেম্বারে আনা সমস্যা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বয়স্ক রোগী। বয়স্ক বাবা মা এরাই। তাদের বাড়িতে আমার দেখা রোগীর অবস্থান ও দুই একটি ঘটনা তুলে ধরলাম—

ক) মহিম আমাকে ওর কলোনি মোড়ের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল ওর মাকে দেখানোর জন্য। মহিমের বৃদ্ধা মাকে রাখা হয়েছে বাড়ির সিঁড়ি ঘরে। একটা মশার কয়েল জ্বালানো আছে। শক্ত বিছানায় প্লাস্টিক পেতে দেওয়া আছে। আমি তার ঘরে ঢুকলে একটা টুল এনে দিল আমাকে বসতে।

ছোটো একটা বাল্ব টিম টিম করে জ্বলছে। মহিম ভালো চাকরি করে। স্ত্রী কণা আর এক ছেলে রাজু, বয়স নয় বছর। মহিম বলে গেল, ‘ডাক্তারবাবু, মায়ের যা অবস্থা বেশি টানা হেঁচড়া করতে চাই না। নার্সিং হোম বা হাসপাতালে মা যেতে চায় না। তা ছাড়া সুইও ফোঁটাতে চাই না, কোন ইনজেকশন লিখবেন না।আর কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা লিখবেন না। সেই ভাবে ওষুধ লিখে দেবেন। ক’দিন আর বাঁচবে।’

অবাক হয়ে মহিমের দিকে তাকালাম। তার মাকে কি ভাবে চিকিৎসা করতে হবে বলে দিচ্ছে আমাকে। এই না হলে সন্তান! একটু কর্কশ ভাবেই বললাম,

'মহিম, এত শর্ত দিলে আমি তো ডাক্তারি করতে পারব না। অন্য কোন ডাক্তার ডেকে আনতে পার, দেখো যদি তোমার সমস্ত শর্তে রাজি হয়ে তোমার মায়ের চিকিৎসা করেন।'

এবার মহিম একটু নরম হয়ে বলল, 'আমি সে ভাবে বলতে চাইনি ডাক্তারবাবু, আর তা ছাড়া আজকাল তো কোন ডাক্তার বাড়িতে কলে আসতে চান না।'

এরপর আমি প্রেসক্রিপশন লিখে মহিমের হাতে দিলাম আর বললাম, 'ভালো করে মায়ের যত্ন নিও। আর শোনো, তোমার ছোট্ট ছেলে রাজু বয়স ছয় হলে কি হবে, ওরা সব বোঝে। সেও একদিন তোমাকে অনুসরণ করতে পারে। সে দিনটার কথা ভেবো।' মহিম মাথা নিচু করে থাকল।

খ) মনোজ ওর অশ্বিনী পল্লীর বাড়িতে নিয়ে গেল ওর মাকে দেখাতে। মনোজের বৃদ্ধা মা আছেন বারান্দায় একটা খাটে শুয়ে। রোদ বৃষ্টি ঝড় ঠাণ্ডা গরম সব যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে। একটা মাত্র ঘর। সে ঘরে স্ত্রী বরুণা আর এক মেয়ে সোনাকে নিয়ে থাকে মনোজ।

গ) নতুনপল্লীর প্রশান্তর বৃদ্ধা মা আছেন বাড়ির একটি সাধারণ ঘরে। দেখার জন্য মাসি রেখে দেওয়া আছে। সে চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনা করে। প্রশান্তর ঘর পরিপাটি। সুন্দর ড্রয়িং রুম। ড্রয়িং রুমে বা প্রশান্তর ঘরে মায়ের ঢুকতে মানা। প্রশান্ত আর তার স্ত্রী সুজাতা, মেয়ে মনা আর মা- এই নিয়ে সংসার। নাতি নাতনিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেন না ঠাকুমা।

ঘ) হাটখোলার বুদ্ধদেববাবুর বৃদ্ধা মা যশোদাদেবী আছেন বাড়ির সব চেয়ে ভালো ঘরটিতে। অ্যাটাচড বাথ। বাড়ির সকলে—ছেলে বুদ্ধদেববাবু, বউমা আরতি, নাতি নাতনি—তনু আর টুম্পা আর নাত বউ মিতালি- সকলে মিলে তার খোঁজ খবর রাখে। ঠিকমত ওষুধ খাচ্ছেন কিনা দেখা হচ্ছে। খাবার দাবার ঠিক আছে কিনা খেয়াল রাখা হয়। মা কি খেতে ভালবাসেন সে অনুযায়ী তার খাবার তৈরি হচ্ছে। মায়ের সময় কাটানোর জন্য টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা আছে। তা ছাড়া বাড়ির সকলেই যশোদাদেবীর সঙ্গে সময় দেয়, গল্প করে।

ঙ) ডাকবাংলো মোড়ের তরুণবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম তার মাকে দেখতে নয়। তার স্ত্রী রাধারানীকে দেখতে। তার স্ত্রী অসুস্থ, বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না তাই আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। সুন্দর সাজানো বাড়ি ঘর। সোফা কারপেটে ঝকঝকে ড্রয়িং রুম। আমাকে স্ত্রী রাধারানীর সোজা বেডরুমে নিয়ে বসালেন তরুণবাবু। রাধারানীকে দেখে হাত ধুয়ে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তরুণবাবু, আপনার মা কেমন আছেন?'

—'মা ভালো আছেন।'

—এটুকু বলতে না বলতেই পাশে দাঁড়ানো তরুণবাবুর ছয় বছরের ছেলে

পিকু বলে ওঠে, 'ঠাম্মাকে তো বাবা মা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। আমি আর ঠাম্মা কত কাঁদলাম, মা বাবা শুনলই না। বাবা, চলো না ঠাম্মাকে দেখব। কতদিন দেখি না আমার ঠাম্মাকে।'

—'না ডাক্তারবাবু, মায়ের ইচ্ছাতেই বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে হল মাকে। বৃদ্ধাশ্রমেই তিনি থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই মায়ের ইচ্ছাতেই লেকটাউনের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসলাম। তবে কি জানেন ডাক্তারবাবু, বৃদ্ধাশ্রমটি বেশ ভালো। সব সুযোগ সুবিধা আছে।'

চ) এবার যে মায়ের কথা বলব সেটা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। আমার কানও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবু এই অভাগা মায়ের কথা বলতেই হবে। ২০০৫ সালের ১৫ই জুনের ঘটনা। বিশেষ বিশেষ ঘটনা আমি লিখে রাখি, তাই দিন তারিখ বলতে পারলাম। বারাসাতের নবপল্লীর মদন সাহা মস্ত ব্যবসায়ি। আমাকে ফোন করলেন ,'মা অনেকদিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। একবার যদি বাড়ি এসে দেখে যান।'

আমি চেম্বারে রোগী দেখা শেষ করে দুপুরে তার বাড়ি গেলাম। বাড়ীতেই ছিল মদন সাহা। মায়ের ঘরে নিয়ে বসতে দিলেন। দেখে বললাম, 'মদনবাবু মায়ের এ কি অবস্থা, ডাক্তার দেখাননি কত দিন? এ কি অবস্থা এত ব্লাডপ্রেসার! সেই সঙ্গে চেস্ট ইনফেকসান। ব্লাড সুগার বেশি আছে কি?'

মদন সাহা যা বললেন তাতে কষ্টই পেলাম। মদন সাহা বললেন, 'অনেক আগে নন্দন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। তখন সুগার প্রেসার দুটোই ধরা পড়েছিল। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখেছিলেন, রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিলেন। সুগার প্রেসারের ওষুধ মা কিছুদিন খেয়েছিল। মা ভালো বোধ করছিল তাই ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর নন্দন ডাক্তারকে বাড়ি কলে আনলে সেই একই ওষুধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখেন আর যতবার বাড়িতে ডাকি ততবারই একগাদা ফি দিতে হয়।'

বললাম, 'আপনি ওষুধ বন্ধ করে দিলেন? ডাক্তারকেও আর দেখাননি?'

মদনবাবু বললেন, 'আপনি দেখুন। প্রেসক্রিপসান করে দিন। মায়ের অবস্থাও তো ভালো না, কতদিন আর টিকবে কে জানে।' আমি বললাম, 'কে কতক্ষণ বাঁচবে তা কে বলতে পারে?'

এরপর যখন চলে আসব তখন বললেন, 'ডাক্তারবাবু, একটা কাজ করবেন? তারিখটা ফাঁকা রেখে মায়ের একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেবেন? মা কখন মারা যাবে তো ঠিক নেই। আর তা ছাড়া তখন যদি আপনাকে না পাই? তারিখটা বসিয়ে নেব। আসলে ডেথ সার্টিফিকেটের জন্যই আপনাকে আজ ডেকে আনা।'

আমি আর থাকতে পারলাম না ধৈর্য ধরে রাখতে। তাকে বললাম, 'আপনার ডেথ সার্টিফিকেটটাও একই সঙ্গে লিখে রেখে যাই। দেখা গেল আপনার মায়ের

আগেই আপনিই মারা গেলেন। তখন কি হবে আপনার? কোথায় পাবেন আপনার ডেথ সার্টিফিকেট?'

মদনবাবু এবার ঘাবড়ে গেলেন আমার কথা শুনে। আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম। এরপর মদনবাবুর মায়ের কি হয়েছিল আমি জানতে পারিনি।

মায়ের এই যে পাঁচ প্রকারের অবস্থান। এর কারন কি? সব কি অর্থনৈতিক? নাকি অন্য কোন আবেগ বা প্রবণতা কাজ করছে? আমি তো অনেক রকম মানুষের বাড়িতেই গেছি। ধনী গরিব, বিরাট রকম ধনী আবার ভয়ানক রকম গরিব, সকল প্রকার বাড়িতে যেয়ে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পেয়েছি। আর বাড়ির মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। একই বাড়িতেও মায়ের এই অবস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও আবেগ কাজ করতে দেখেছি। আবেগ তার দৃষ্টি নির্ধারণ করে দেয়। সে অনুযায়ি মায়ের অবস্থান নির্ধারিত হয় কোন ঘরে কেমন পরিবেশে তার অবস্থান হবে।

আবেগ কিন্তু স্থির কিছু নয়, আবেগ পরিবর্তনশীল। সকলেই যে অনড় অবস্থানেই থাকে তা নয়। কিছু মানুষকে বুঝিয়েছি। তারা অনেকে বুঝেছে। অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আমিও হাল ছাড়িনি। বারে বারে আঘাত করেছি। আমি জানি আবেগ ও অভিজ্ঞতা একে অন্যের পরিপূরক।

একই রকম ধনী বাড়ি অথচ তাদের মায়ের অবস্থান ভিন্ন- কোন মা সিঁড়ি ঘরে, কোন মা ভালো ঘরে।

- একই রকম ধনী বাড়ি। মায়ের ওষুধ পথ্য খাবার দেখা শোনা সবই ভালো চলছে। ছেলে খবর নিচ্ছে, 'মা ঠিক মত খেয়েছ? শরীরে কোন কষ্ট আছে কিনা?' পুত্রবধূ নিজ হাতে শাশুড়িকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। পরিচর্যা করছে। গল্প করছে অবসর পেলে। নাতি নাতনি ঠাকুমাকে নিয়ে মজা করছে।
- একই রকম ধনী বাড়ি অথচ মা এক কোনে পড়ে আছে। মা কখন খেল না খেল দেখার কেউ নেই, সময়ও নেই কারো। কবে একদিন এক ডাক্তার দেখিয়ে গেছে দুই বছর আগে। সেই পুরনো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে মাঝে মাঝে তার থেকে একটা দুটো ট্যাবলেট এনে দেয় মাকে। তার শরীরে বা মনে কি কষ্ট তা শোনার কেউ নেই। ছেলে, ছেলেবউ, নাতি নাতনি সকলে শুধু ব্যস্ত তাদের নিজেদের নিয়ে।
- গরিব ঘরে গিয়েছি- তাদের মা আদর যত্নেই আছে, যা জোটে সেভাবেই মাকে নিয়ে ভালো রাখার চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। নিয়মিত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওষুধ দেয়। মায়ের কোন কষ্ট হলে ছেলের কষ্ট হয়। মাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হতে দেখেছি অনেক সন্তানকেই।
- গরিব ঘরে গিয়েছি- বৃদ্ধ বয়সেও মাকে আলাদা করে রেখেছে।

হাড়ি আলাদা। দেখা শোনার কেউ নেই। ‘হরি পার কর আমারে’—বলে চিৎকার করেন যন্ত্রণায়। সকলেই যেন অপেক্ষা করছে মায়ের বিদায়ের। আজ মায়ের অবস্থা ভালো ঠেকছে না। খুবই সংকটাপন্ন তাই ছেলে ডাক্তার ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা করানো মূল কথা নয়- মরার পর ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে, সে জন্য ডাক্তার দেখিয়ে রাখা।

এই সকল অবস্থার নির্ণায়ক কে? কখনোই অর্থনৈতিক অবস্থার দোষ বা গুন দিয়ে নিরূপণ করা যাবে না। সব কিছুর পিছনে রয়েছে ওই সকল মানুষগুলির আবেগ এবং দীর্ঘদিনের আবেগ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ।

- এক এক ধরনের আবেগ মানুষের মন দয়ালু করে তোলে এবং সে দয়ালু মন শুধু তার মা বাবার প্রতিই প্রদর্শন করে তা নয়। যে দয়ালু সে সকলের প্রতিই দয়ালু। বাড়ির কাজের লোক, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ভিখিরি অথবা প্রভু বা মালিক সকলের প্রতিই তার দয়ালু মন কাজ করে। আবেগ শ্রেনিবিন্যাস করে না।
- আর যে মানুষটি রুক্ষ প্রকৃতির, তার সকল কাজকর্ম সর্ব ক্ষেত্রেই সে রুক্ষ। রুক্ষতার আবেগ নিয়ে সে নিজেকে তৈরি করেছে সে ভাবে বা বলা যায় তৈরি হয়েছে সে ভাবেই। সে বাবা মা স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজন কাজের লোক সকলের সঙ্গেই একই রকম রুক্ষ আচরণ করে। সে নিজের ক্ষেত্রেও একই রকম করে। পাড়ার মানুষের নিকট পরিচিত হয় এমন ভাবে-‘ওই বাড়ি? ও বাড়িতে যেওনা। খুব খারাপ মানুষ ওরা।’ ভিখিরিও ও বাড়িতে যায় না। নিজের ছেলে মেয়েরাও বাবা কখনও কোন কাজে বাড়ির বাইরে কিছুদিন গেলে স্বস্তি অনুভব করে।

এবার আলোচনায় যাব আবেগের প্রকারভেদের উপর। আবেগ নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের আগে বলছি একটু ধৈর্য নিয়ে পড়লে দেখবেন নিজেও একজন বিশ্লেষক হয়ে গেছেন। নিজের জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে কত ঘটনা মিলে যাচ্ছে এবং নিজেই আবেগ সম্বন্ধে নতুন ধারণা প্রস্তুত করতে পারবেন এবং আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

শুধু তাই নয়। আপনিও চর্চায় থাকলে, সদিচ্ছায় থাকলে বদলাতেও পারবেন মানুষকে। আমি অনেককে বদলেছি। পরে সে সকল ঘটনা অবশ্যই আলোচনা করব। আমার জীবনের অনেক কাহিনি শোনাব দেখবেন, আমি যদি পারি আপনিও পারবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমগ্র সমাজে বদল আনতে পারে। সকল মানুষকে একটু কষ্ট করতে হবে আর মানুষের মধ্যে বদলের কথা ভাবতে হবে।

আবেগের প্রকারভেদ -

পণ্ডিত একম্যান যে ছয় প্রকার মৌলিক আবেগের কথা বলেছেন কমপক্ষে তাকে ভিত্তি করে আরও ২৭ প্রকার আবেগের হদিশ পেয়েছেন পণ্ডিতেরা। যদিও পণ্ডিত একম্যানের মৌলিক ছয়টি আবেগের তত্ব নিয়ে এখনও অনড় অনেকেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে অন্যরা বলছেন, আরও অনেক রকম আবেগ আছে অবশ্যই। তবে সে সকল আবেগগুলোর মধ্যে মৌলিক আবেগ বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে, সে সকল আবেগের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় অন্য আবেগের।

মানুষের আবেগ নিয়ে এত গবেষণা চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যার ফলে নিত্য নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, নতুন নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে তার শ্রেণী বিভাগ করছেন। নিত্য নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে।

পণ্ডিত একম্যানও কিছু নতুন আবেগ তালিকাভুক্ত করেছেন তবে এগুলির বিশেষত্ব এই যে এগুলির তেমন কোনও মুখের ভাব বা শারীরিক প্রকাশভঙ্গি থাকে না যা পূর্বোক্ত মৌলিক আবেগে প্রকাশ পায়।

সেগুলি হচ্ছে-

- পরিতৃপ্তি
- সন্তোষ
- উত্তেজনা
- অবজ্ঞা
- বিব্রত
- বিমুঢ়তা
- মুক্তি
- কৃতিত্বে গর্ব
- অপরাধবোধ
- লজ্জা
- স্বার্থপরতা
- হীনমন্যতা

আবেগ নিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে চলেছেন। এমনও বলছেন, দুটি বা তিনটি মৌলিক আবেগ রয়েছে। বাকি সব শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। পণ্ডিতেরা তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে আবেগ নিয়ে বিস্তর লিখছেন। কিছু আবেগ, যেমনঃ ভালোবাসা, আনন্দ, অবাক বা বিস্ময়, রাগ এবং দুঃখ এগুলোকে আরও বিভাজিত করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধরা যাক প্রেম।

প্রেম হচ্ছে প্রাথমিক আকর্ষণ ও কামনাপূর্ণ বাসনা থেকে উদ্ভূত আবেগ।

প্রাথমিক আকর্ষণ চোখের দেখা থেকে হতে পারে, গল্প শুনে হতে পারে,ফোনালাপে হতে পারে। এর পরের ধাপই হচ্ছে কামনা। কামনা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যৌন আগ্রহ বা যৌন ইচ্ছা, অধিকার বোধ, পাওয়ার বাসনা, ক্ষুধা, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি আবেগের যে কোন একটি বা দুটি প্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তখন প্রেম নামক আবেগে আবিষ্ট হয় মন। প্রেম নিয়ে পরে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে অবশ্যই। আরও কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেগ আছে যেগুলিকেও তালিকাভুক্তি করে আলোচনা করাই যায়। যেমন-

- যত্ন
- পছন্দ
- অপছন্দ
- সমবেদনা
- স্নেহশীলতা
- মায়া

এই সকল আবেগ বেশিরভাগই মনের মধ্যে নিশ্চুপে ক্রিয়াশীল থাকে। কখনই উচ্চকিত হয়ে চিৎকার জুড়ে দেয় না। হাহাকার করে না। যত্ন, পছন্দ, অপছন্দ, সমবেদনা, স্নেহশীলতা এবং মায়া- এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনের গভীরে ক্রিয়াশীল থাকে এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে মনকে প্রভাবিত করে চলে। এদের প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী।

সমকালীন সময়ে অন্তত ২৭টি সুনির্দিষ্ট আবেগ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং দেখা গেছে প্রতিটি আবেগই কোন না কোন ভাবেই একটি আরেকটির সাথে জড়িয়ে আছে, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বের বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন ৮০০ জন মানুষের আবেগের উপর এবং একই সঙ্গে ২০০০ এরও অধিক ভিডিও ক্লিপ পর্যালোচনা করেছেন। তারা একটি ম্যাপ প্রস্তুত করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে একটি আবেগ অন্য আবেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে মানুষের মনে বিরাজমান থাকে ও ক্রিয়া করে।

গ্রেটার গুড সায়েন্স সেন্টারের বিশিষ্ট গবেষক ডাচার কেল্টনার বলেছেন, 'সম্পূর্ণ একাকী কোন আবেগের একক স্বাধীন কোন অবস্থা থাকতে পারে না, তার সঙ্গে অন্য আবেগের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় অথবা অন্য আবেগ সৃষ্টি হয় আপনা আপনি।'

কেল্টনার অবশ্য স্বীকার করেছেন যে কোন কোন আবেগ একক ভাবে অবস্থান করে নিতে পারে সময় ও ব্যক্তির আচরণের উপর। তবে সকল আবেগই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন সন্ন্যাসীদের আবেগ খুব কম থাকে। তাই তারা একমনে ধ্যানস্থ থাকতে পারেন কোন রকম আবেগবিহীন অবস্থায়।

যে কোন মানুষই সন্ন্যাসীদের মত আবেগহীন ধ্যানস্থ হতে পারেন ইচ্ছা করলে। নিজের মনকে বিযুক্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে নিজের শরীর থেকে, সংসার থেকে, সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে এমনকি বিশ্ব থেকে। নিজের সুখ বা দুঃখ থেকেও মনকে বিযুক্ত করতে হবে। তখনই আবেগহীন অবস্থায় ধ্যান করতে পারেন।

আবেগহীন অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। সাময়িক ভাবে হয়ত কিছুক্ষণ থাকতে পারে। সর্বক্ষণ আবেগ মানুষের মনের অলিগলিতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলেছে। একটি আবেগ স্থান করে নিতে পারলেই তার উপর অন্য একটি আবেগকে আমন্ত্রণ করে আনে। এই দুটি আবেগ মিলে একটি তৃতীয় আবেগের জন্ম দেয়।

ইউ সি বারক্লের নিউরোসায়েন্সের ছাত্র অ্যালান কোয়েণ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিজ্ঞানী, মনোবিদ ও চিকিৎসকদের উৎসাহিত করে যে কি ভাবে আবেগ প্রভাবিত করে মানুষের মস্তিষ্ক, মানুষের ব্যবহার ও মেজাজ। আবেগের ঘাটতি অথবা আবেগের আধিক্য কি ভাবে মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করে সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। আবেগশূন্য মানুষ হয় না।

অধোগতির আবেগ মারাত্মক মানসিক রোগের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় যা সহজে ধরা পড়ে না যদি না আশেপাশের মানুষ সতর্ক না হয়। যখন সেটা ধরা পড়ে তখন দেখা যায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে কোন আবেগের আতিশয্যও একই প্রকারে মানুষের মধ্যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে।

কিছু মানুষ নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারে যে সে আবেগের ঘাটতি বা আধিক্য দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। তারা তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর অনেকে নিজেকে বিশ্লেষণ তো করেই না উপরন্তু পারিপার্শ্বিক বিষয় বা আশেপাশের মানুষকে দোষারোপ করতে শুরু করে সমস্যা বাড়িয়েই চলে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিস্থিতিকে দোষারোপ করা সবটাই নির্ভর করছে তার মানসিক পরিপক্কতার উপর। এটা শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বয়সের উপর নির্ভর করে না। অনেক অতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও দেখা যায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সেখানে একজন কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা কম বয়সের মানুষও নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে।

কলিন্স খুব সুন্দর করে এক বিপরীতমুখী অবস্থানে আবেগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তুমি যে সকল মানুষের সঙ্গে থাকছ অথবা মানুষের মধ্যে বসবাস করছ সেই সকল মানুষের সঙ্গে অবস্থানে তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয় সুখের অনুভব, প্রেম, ভয়, উত্তেজনা, যৌনতা, ক্রোধ অথবা ঘৃণা।' তিনি আবেগের উৎসই পালটে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সুখের অনুভব, প্রেম, ভয়, ক্রোধ

অথবা ঘৃণা থেকে সৃষ্টি হয় নতুনতর আবেগ। অথচ আমি বলতে চাইছি একটি মানুষের আবেগের ধরণ, পরিমাণ ও পরিমিতির উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হবে তার সুখের অনুভব, প্রেম, ভয়, ক্রোধ অথবা ঘৃণা। এ ক্ষেত্রে আমার একেবারে বিপরীত অবস্থান।

আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে যার আবেগ কম তার রাগ বা ক্রোধ কম হবে। আবেগপ্রবণ মানুষ অতি অল্পেই রেগে যাবেন বা দুঃখ পাবেন। আবেগ মানুষের সহজাত। আর অন্য অনুভূতিগুলো সবই আবেগ সঞ্জাত। আমি এভাবে আবেগ ও অনুভূতির মধ্যে একটা সীমারেখা টেনেছি।

আবেগ কি কঠিন ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভাবলে অবাক হতে হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আইন, পুলিস, বিচারক, ধর্ম এদের চেয়েও ক্ষমতাবান আবেগ। যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আবেগ সব সময় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। অন্য বন্ধু বা আত্মীয় তারাও কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উপদেশ আদেশ দিতেই পারে বা দিয়েই থাকে। কিন্তু সব কিছুর আগে দেখা যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে তার আবেগ। অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই আবেগ। তার নির্দেশেই মানুষ পরিচালিত হয়।

কি আশ্চর্য মানুষের নিয়ন্ত্রক এই আবেগ আবার ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ ও চরিত্র বদলায়। আর তার ফলেই একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন রকম ব্যবহার করে বসে।

ভালো বা খারাপ ব্যবহার যে কোনটিই সংঘটিত হতে পারে একজন মানুষের দ্বারা। কেউ বলছে, মানুষটি খুব ভালো। আবার অন্য কেউ বলছে, ওর মত খারাপ মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এ সম্ভব শুধু তার বিভিন্ন সময়ে আবেগের হেরফের হওয়ার কারণে। আবেগ বড়ো হেঁয়ালি। একটা মানুষ এই ভালো, এই মন্দ, এই উচ্চগ্রামে আবার এই নিস্তেজ। মানুষ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে নাকি আবেগ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্ধারণ করতে পারিনি আমিও। আমি চেষ্টা করছি এটা করব না, অথচ সেই কাজের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। বুঝতেই পারি এটা করা উচিৎ নয়, অথচ সেটাই করতে চলেছি এবং করছিও। এটাই অবসেশন।

আবার অনেক ক্ষেত্রে বুঝেছি এটা করা উচিত অথচ করাই হল না। সব ক্ষেত্রেই আবেগের জ্যাঠামো। কখনই সরল পথে চলে না বা চলতে দেয় না। আর তাই মানুষের আচার ব্যবহার এত বৈচিত্রময়। সে জন্যই মানুষের এক জীবনে এত দুঃখ এত হাসি, এক জীবনে এত বিপরীত প্রবাহ।

মানুষ ব্যস্ত রয়েছে তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের তাগিদে। সেজন্যেই মানুষ কাজ করে চলেছে এবং তার কাজের বেশির ভাগ ব্যয়িত হয়

এজন্যেই। কিন্তু মানুষের জীবনধারণের নিত্যক্রিয়া কর্ম ও তার প্রয়োগ ও প্রযুক্তির বাইরে একটি জগৎ আছে। সেই জগতের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই অধিকার করে রেখেছে আবেগ আর আবেগের প্রতিশ্রুতি। আবেগ একটি সর্বব্যাপী অধ্যায়। আবেগ মানুষের সর্বগ্রাসী অধ্যায়। আবেগ হচ্ছে সুখ দুঃখ ভালোবাসা ভয় ঘৃণা ক্রোধ অথবা হিংসার এক এক অনুভূতি যার সঙ্গে একেবারে নিজে এবং আশেপাশের এমনকি দূরের মানুষও সম্পর্কিত।

আবেগ আর চিন্তা কিন্তু এক জিনিস নয়। দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, একটা দূরত্ব আছে। বলা যায় চিন্তার বিপরীতে আবেগের অবস্থান। চিন্তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। চিন্তা করতে গেলে একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন। মানুষের মস্তিষ্ক চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষ ইচ্ছা করলে একটি চিন্তাকে বন্ধ রেখে অন্য একটি চিন্তার দরজা খুলতে পারে। আর আবেগ অন্তরের অন্দরে ঘোরাফেরা করে অবাধে। অবাধ গতি তার। কখন আসে কখন যায়, কোথায় থাকে কিছু ঠিক নেই। আবেগ একটি মানুষের সব কিছুই প্রভাবিত করে, অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। আবেগ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে আর মানুষ চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কারও আবেগ খুব বেশি আবার কারও কম। আবেগ যে কোনও মানুষের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। প্রচণ্ড দুঃখ বোধ একটি মানুষকে সর্বত্যাগী ও অকর্মণ্য করে বসিয়ে রাখতে পারে। আবার আবেগ মানুষকে ভয়ানক সাহসী করে তুলতে পারে। আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে। প্রচণ্ড দুঃখে আত্মহত্যা করে আবার কেউ অন্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও পারে।

Emotion is a mental state associated with the nervous system brought on by chemical changes variously associated with thoughts, feelings, behavioural responses, and a degree of pleasure or displeasure. There is currently no scientific consensus on a definition. Emotion is often intertwined with mood, temperament, personality, disposition, and motivation.

Research on emotion has increased significantly over the past two decades with many fields contributing neuroscience , medicine, history,sociology of emotions including psychology, endocrinology, , and computer science. The numerous theories that attempt to explain the origin, neurobiology, experience, and function of emotions have only fostered more intense research on this topic. Current areas of research in the concept of emotion include the development of materials that stimulate and elicit emotion. In addition PET(Positron Emission Tomography) scans and MRI(Magnetic Imaging Resonance) scans help study the affective picture processes in the brain.

Emotions can be defined as a positive or negative experience that is associated with a particular pattern of physiological activity. Emotions produce different physiological, behavioural and cognitive changes. The original role of emotions was to motivate adaptive behaviours that in the past would have contributed to the passing on of genes through survival, reproduction, and kin selection.

In some theories, cognition is an important aspect of emotion. Those acting primarily on the emotions they are feeling may seem as if they are not thinking, but mental processes are still essential, particularly in the interpretation of events. For example, the realization of our believing that we are in a dangerous situation and the subsequent arousal of our body's nervous system (rapid heartbeat and breathing, sweating, muscle tension) is integral to the experience of our feeling afraid. Other theories, however, claim that emotion is separate from and can precede cognition. Consciously experiencing an emotion is exhibiting a mental representation of that emotion from a past or hypothetical experience, which is linked back to a content state of pleasure or displeasure. The content states are established by verbal explanations of experiences, describing an internal state.

Emotions are complex. According to some theories, they are states of feeling that result in physical and psychological changes that influence our behaviour. The physiology of emotion is closely linked to arousal of the nervous system with various states and strengths of arousal relating, apparently, to particular emotions. Emotion is also linked to behavioural tendency. Extroverted people are more likely to be social and express their emotions, while introverted people are more likely to be more socially withdrawn and conceal their emotions. Emotion is often the driving force behind motivation, positive or negative. According to other theories, emotions are not causal forces but simply syndromes of components, which might include motivation, feeling, behaviour, and physiological changes, but no one of these components is the emotion. Nor is the emotion an entity that causes these components.

Emotions involve different components, such as subjective experience, cognitive processes, expressive behaviour, psychophysiological changes, and instrumental behaviour. At one time, academics attempted to identify the emotion with one of components.

William James with a subjective experience behaviourists with

instrumental behaviour, psycho physiologists with physiological changes, and so on. More recently, emotion is said to consist of all the components. The different components of emotion are categorized somewhat differently depending on the academic discipline. In psychology and philosophy, emotion typically includes a subjective, conscious experience characterized primarily by psychophysiological expressions, biological reactions, and mental states.

A similar multicomponential description of emotion is found in sociology. For example, Peggy Thoits described emotions as involving physiological components, cultural or emotional labels (anger, surprise, etc.), expressive body actions, and the appraisal of situations and contexts.

There are many different types of emotions that have an influence on how we live and interact with others. We are ruled by emotions. The choices we make, the actions we take, and the perceptions we have are all influenced by the emotions we are experiencing at any given moment.

Psychologists have also tried to identify the different types of emotions that people experience. A few different theories have emerged to categorize and explain the emotions that people feel.

Basic Emotions: During the 1970s, psychologist Paul Eckman identified six basic emotions that he suggested were universally experienced in all human cultures. The emotions he identified were happiness, sadness, disgust, fear, surprise, and anger. He later expanded his list of basic emotions to include such things as pride, shame, embarrassment, and excitement.

Combining Emotions: Psychologist Robert Plutchik put forth a "wheel of emotions" that worked something like the colour wheel. Emotions can be combined to form different feelings, much like colours can be mixed to create other shades. According to this theory, the more basic emotions act something like building blocks. More complex, sometimes mixed emotions, are blending of these more basic ones. For example, basic emotions such as joy and trust can be combined to create love.

A 2017 stydy suggests that there are far more basic emotions than previosly believed. In the study published in proceedings of National Academy of Sciences, researchers identified 27 different categories of emotion. Rather than being entirely distinct, however, the researchers found that people experience these emotions along a gradient.

The six basic emotions described by Eckman are just a portion of the many different types of emotions that people are capable of experiencing. Eckman's theory suggests that these core emotions are universal throughout cultures all over the world. However, other theories and new research continue to explore the many different types of emotions and how they are classified.

Eckman later added a number of other emotions to his list but suggested that unlike his original six emotions, not all of these could necessarily be encoded through facial expressions. Some of the emotions he later identified included:

- Amusement
- Contentment
- Excitement
- Contempt
- Embarrassment
- Relief
- Pride in achievement
- Guilt
- Satisfaction
- Shame
- Selfishness
- Complexity

Other Theories of Emotion-

As with many concepts in psychology, not all theorists agree on how to classify emotions or what the basic emotions actually are. While Eckman's theory is one of the best known, other theorists have proposed their own ideas about what emotions make up the core of the human experience.

For example, some researchers have suggested that there are only two or three basic emotions. Others have suggested that emotions exist in something of a hierarchy. Primary emotions such as:

- ➢ Love
- ➢ Joy
- ➢ Surprise
- ➢ Anger and
- ➢ Sadness.

These can then be further broken down into secondary emotions. Love, for example, consists of secondary emotions such as affection and longing.

These secondary emotions might then be broken down still further into what are known as tertiary emotions. The secondary emotion of affection includes tertiary emotions such as liking, caring, compassion, and tenderness.

A more recent study suggests that there are at least 27 distinct emotions, all of which are highly interconnected. After analysing the responses of more than 800 men to more than 2,000 video clips, researchers created an interactive map to demonstrate how these emotions are related to one another.

"We found that 27 distinct dimensions, not six, were necessary to account for the way hundreds of people reliably reported feeling in response to each video," explained the senior researcher Dacher Keltner, faculty director of the Greater Good Science Centre.

In other words, emotions are not states that occur in isolation. Instead, the study suggests that there are gradients of emotion and that these different feelings are deeply inter-related.

Alan Cowen, the study's lead author and doctoral student in neuroscience at UC Berkeley suggest that better clarifying the nature of our emotions can play an important role in helping scientists, psychologists, and physicians learn more about how emotions underlie brain activity, behaviour, and mood. By building a better understanding of these states, he hopes that researchers can develop improved treatments for psychiatric conditions.

Emotions play a critical role in how we live our lives, from influencing how we engage with others in our day to day lives to affecting the decisions we make. By understanding some of the different types of emotions, you can gain a deeper understanding of how these emotions are expressed and the impact they have on your behaviour.

It is important to remember, however, that no emotion is an island. Instead, the many emotions you experience are nuanced and complex, working together to create the rich and varied fabric of your emotional life?

An emotion is a feeling such as happiness, love, fear, anger, or hatred, which can be caused by the situation that you are in or the people you are with. - as per Collins.

সুখ
(Happiness)

মানুষের সকল আবেগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবেগ হচ্ছে সুখ। মানুষের চাওয়া পাওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে সুখ। মানুষের বেঁচে থাকার অভিমুখ হচ্ছে সুখ। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ যুদ্ধ করে চলেছে সুখের জন্য। অথচ যুদ্ধটাই সুখ বিরোধী। এই স্ববিরোধীতায় মানুষের দিবারাত্রির শুধু সুখ চাই সুখ চাই বলে কত হাহাকার চারিদিকে। একটুখানি সুখের জন্য মানুষ ছুটে চলেছে অবিরত। দিবারাত্র কষ্ট করছে মানুষ একটু সুখের আশায়।

সুখের মূখ্য উৎস হচ্ছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সুস্বাস্থ্য আর এর সঙ্গে ভালোলাগার অনুভূতি। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও সুস্বাস্থ্য সহ সকল ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য থাকা স্বত্বেও যদি ভালোলাগার অনুভূতি সঙ্গে না থাকে তাহলে সুখ বস্তুটি থাকল না। অথচ সুখ ভালোলাগার অনুভূতি, এটাই চোখে দেখা গেল না। ভালোলাগার অনুভূতি ব্যতিরেকে সকল উপাদান শুধু বিড়ম্বনা তৈরি করতে পারে।

একটি মানুষ অনাহারে আছে, খাদ্য চাইল। খাদ্য পেল-সুখও পেল। খাদ্য আছে, বস্ত্র নেই। বস্ত্র পেল, সুখ পেল। বাসস্থান নেই, বাসস্থান চাইল। বাসস্থান পেল, সে সুখ পেল। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান আছে সুস্বাস্থ্য নেই। ওষুধ পেল, ডাক্তার পেল এবং স্বাস্থ্য পেল। অতএব সে সুখ পেল। এখন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও সুস্বাস্থ্য থাকা অবস্থায় যদি ভালোলাগার আবেগ জড়িত না থাকে তখন কোন প্রাচুর্যেও সে সুখ খুঁজে পাচ্ছে না।

সুতরাং এখানে মূখ্য কারিগর আবেগ, সুখের আবেগ, অর্থাৎ ভালোলাগা। এত কথার পরে বলতে চাইছি যে বিষয় নয়, বিষয় ও বস্তুর বাইরে একটা শক্তি আছে—আবেগ, সেইই নিয়ন্তা।

সুখের অন্যান্য উৎস হচ্ছে জয় করা, সুন্দর কিছু দর্শন করা, ভ্রমণ করা, কিছু আবিষ্কার করা, হঠাৎ করে কিছু পেয়ে যাওয়া, কারও দেখা পাওয়া, কারও ভালো সংবাদ শোনা, সুন্দর গন্ধ পাওয়া, নতুন কাপড় পরিধান করা, গান বাজনা শোনা, পাখির ডাক শোনা। তালিকা সহস্র তবুও এটুকু বলা এজন্য যে ভালো কিছুই সুখ এনে দেয়।

কিন্তু মানুষের মন এমনি অদ্ভুত যে এ সকলের বিপরীতেও মানুষ সুখ পেতে পারে। যেমন—অন্যের খারাপ সংবাদ শুনে, অন্যের দুঃখে, অন্য কেউ বিপদে পড়লে। অন্যের প্রচণ্ড ক্ষতির কথা জানলেও সুখ পায় তারা। এমনকি অন্য কারও প্রাণহানির সংবাদও সুখ এনে দেয় তাদের।

সুখের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এত হিমশিম খেয়েছেন যে আর কোন বিষয়ে এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়নি তাদের। বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞজনেরা এবিষয়ে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন সেটাই বলার চেষ্টা করছি। সুখ হচ্ছে এমন একটা দৈহিক ও মানসিক অবস্থা যা বেশ কয়েকটি আবেগের যৌগিক মিশ্রণ। যেমন-কোন কিছুতে পরিতৃপ্তি লাভ করা, যে কোন কাজে বা অবস্থানে আনন্দ লাভ করা, তুষ্টি লাভ, কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বোধ করা। এই সকল আবেগগুলির একটি বা একের অধিক আবেগের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে সুখ।

১৯৬০ সালের দিকে পণ্ডিতেরা সুখ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও নিরীক্ষা চালান। শেষমেশ তাঁরা বলেন সুখ হচ্ছে একটা ধনাত্মক আবেগ ও ধনাত্মক মনঃস্তত্ব। সুখ একটা অগ্রগামী আবেগ যা পিছনে হটতে পারে না। সুখের অনুভূতি মানুষকে সামনেই এগিয়ে নেয়। এখানেই সুখানুভূতির সাথে ভোগবাদের পার্থক্য। ভোগবাদ মানুষকে পিছনে নিয়ে যায়, কর্মবিমুখ করে তোলে আর সুখ মানুষ ও সমাজের অগ্রগতি ঘটায়।

কেউ কেউ সুখ আর ভোগকে গুলিয়ে ফেলে। সুখ একটি স্বচ্ছ উপকারী আবেগ আর ভোগবাদ একটি ক্ষতি সাধনকারী উন্মাদনা। ভোগ মানুষকে ক্রমাগত ক্ষুধার্ত করে তোলে। সুখ মানুষকে ক্রমাগত পরিতৃপ্তির পথে নিয়ে যায়। ভোগ মানুষকে আক্রমণাত্মক করে তোলে। সুখ মানুষকে দয়ালু করে তোলে।

ভোগ মানুষকে রাক্ষসমুখি করে, তখন ভালো মন্দের বিভেদ দেখতে পায় না মানুষ। সুখ মানুষকে নির্লোভ করে, অধম ও উত্তম চিহ্নিত করতে পারে। সুখী মানুষ সকলকে সুখী দেখতে পছন্দ করে। -এই কথাগুলোই আবার পূর্বের কথা থেকে আলাদা। এটাই হচ্ছে অদ্ভুত স্ববিরোধীতা।

সুখী মানুষের যৌনজীবন পরিতৃপ্তির হয়। ভোগবাদীরা বহু নারীতে আসক্ত হয় অথবা আসক্তি বোধ করে কিন্তু তারা সর্বদাই যৌনঅতৃপ্ত, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সর্বক্ষেত্রেই অতৃপ্ত তারা।

ভোগবাদী মানুষ সব সময় হিংসাশ্রয়ী। ভোগবাদী মানুষ দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। বেপরোয়া জীবন যাপন করে এরা। ভোগবাদী মানুষ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, পেটের পীড়া, ও লিভারের রোগে বেশি ভোগে। অসুস্থ হলে ওষুধ খেতে বা ডাক্তার দেখাতেও আলস্য এদের। ডাক্তারের বেঁধে

দেওয়া উপদেশ মানতেও নারাজ এরা। সে জন্যে ভোগবাদীদের অকালমৃত্যুর হার বেশি।

অন্যদিকে নিজের সুখ পেতে গিয়ে মানুষ কত যে অন্যের দুঃখের কারণ হচ্ছে তারও হিসেব কেউ রাখে না। অন্যের কত অনিষ্ট করেও সুখ পেতে চাইছে এক শ্রেণির মানুষ। এটা পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করছেন যে মানুষের প্রতিটি কাজ বা পদক্ষেপের পেছনেই থাকে তার সুখের তাড়না।

কেউ অর্থ উপার্জন করে বলছে, আমি সুখী। কোন ভিখিরি রাস্তায় একতারা বাজিয়ে দিনশেষে একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করে বলছে, আমি সুখী।

কেউ গান শুনে বলছে, বাহ বেশ সুখ। কেউ সুখাদ্য গ্রহণ করে বলছে কত সুখ।

কেউ একটি দুঃখের কাহিনীর সিনেমা দেখে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে হল ছেড়ে বেরোচ্ছে আর বলছে, কি সুন্দর সিনেমা, কি সুখ কেঁদেও।

কোন হিংসাশ্রয়ী মানুষ খুন করে পাচ্ছে সুখ। কেউ সেই খুনিকে শাস্তি দিয়ে সুখ পাচ্ছে।

কেউ অন্যকে বঞ্চিত করে বলছে, আহ কি সুখ। কেউ নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে বলছে,'আহ! কি সুখ।' ধর্ষক ধর্ষণ করে সুখ পাচ্ছে, আর একজন ধর্ষিতা ও নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে সাহায্য করে সুখানুভূতি নিয়ে ঘরে ফিরছে। বিচিত্র এ জগৎ আর জগতের মানুষ ও তাদের আবেগ।

সুখের সময় মানুষের বহিরঙ্গে তিনটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ-

- মুখে একটি হাসির অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে
- শারীরিক ভাষা হয়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ, নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত
- কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও চিত্তগ্রাহী

সুখ মানুষের মৌলিক চাহিদা বা আবেগ যা তার সংস্কৃতি দ্বারাও অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন পপ কালচারের মানুষদের সুখের আবেগ সম্পূর্ণ অন্যরকম। তারা সুখ পাবে একটি বড়ো বাড়ি বা অভিজাত শহরে একটা ফ্লাট কিনলে অথবা একটা ভালো মাইনের চাকরি পেলে। এই পপ কালচারের মানুষটির কোন সাধারণ আত্মীয়ের মধ্যে হয়ত ভাবলেশহীন কোন অনুভূতি তৈরি করবে মাত্র। অর্থাৎ সুখ ব্যক্তি, গোত্র, অবস্থান ও পরিবেশ বিশেষে ভিন্ন হতে বাধ্য।

মানুষের এটা দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস যে সুখ ও সুস্বাস্থ্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এ কথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে যে সুখ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। যে বেশি সুখি সে তত বেশি সুস্থ। সে তত কম

ডাক্তারের নিকট যায়, তত কম ওষুধ খায়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে সুখি মানুষেরা চিরকালই দীর্ঘায়ু হয় এবং তাদের পরিতৃপ্ত দাম্পত্য জীবন হয়, তারা পরিতৃপ্ত যৌন সুখ ভোগ করে।

সুখের উৎস খুঁজতে গিয়ে অবাক হতে হয়েছে, মানুষ যে কিসে সুখ পায় আর কিসে সুখ পায়না? ভাবতে গিয়ে বিব্রত হয়েছি।

কেউ উপার্জন করে সুখ পায়।

কেউ উপার্জন করে সবটুকুই সঞ্চয় করে সুখ পায়।

কেউ উপার্জন করে সব খরচ করে সুখ পায়।

কেউ ধার করে সুখ পায়।

কেউ ধার-কর্জ করে ফেরত না দিয়ে সুখ পায়।

কেউ পেটভর্তি খেয়ে সুখ পায়।

কেউ পেটভর্তি খাওয়াতে পারলে সুখ পায়।

কেউ অন্যের কষ্টে সুখ পায়।

কেউ অন্যের বিপদে সুখ পায়।

কেউ অন্যের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে সুখ পায়।

কেউ ভিক্ষা করে সুখ পায়।

কেউ ভিক্ষা দিয়ে সুখ পায়।

কেউ দান করে সুখ পায়।

কেউ ছিনতাই করে সুখ পায়।

এই বৈপরীত্যের তালিকা যে কত দীর্ঘ হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

একটি অকপট স্বীকারোক্তি শুনলে সকলেই অবাক হবেন। যার কথা বলছি তিনি হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। একজন ভালো পদমর্যাদার সরকারি অফিসার হরিহরণবাবু (পরিবর্তিত নাম)। প্রথমে ছিলেন আমার রোগী। তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে বাড়তে হরিহরণবাবু আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। তার বাড়িতে যে কোন ছোটো বড়ো অনুষ্ঠান হলে আমার নেমন্তন্ন থাকবেই। কোন কারণে যদি না যাই তবে রাগের শেষ নেই, আমার কৈফিয়তের অন্ত নেই। বাড়ির তৈরি ভালো খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে আমার বাড়ি পৌঁছে যাবে। প্রথমে জানতাম হরিহরণবাবু খুবই ভালো মানুষ। অতি সদাশয় ব্যক্তি।

পরে জানতে পারলাম যে তিনি তার অফিসে প্রচণ্ড ঘুষ নেন। ঘুষ ছাড়া তিনি কোন কাজই করেন না। কথাটা জানার পর আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর থেকে ওই লোকটিকে এড়িয়ে চলা শুরু করলাম। তিনি প্রথমে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি। একসময় তো বুঝবেনই। বুঝলেনও তিনি। একদিন সকালবেলায় সটান আমার বাড়ি এসে হাজির। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি ডাক্তারবাবু,

আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এড়িয়ে চলছেন আমাকে। কি ব্যাপার বলবেন?'

আমি ইতস্তত করছিলাম। হরিহরণবাবু বললেন,'আপনার কি সমস্যা আমাকে বলতে পারেন। আপনি আমার হিতকারী বন্ধু, আমাদের পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক। আমাকে লুকোবেন না।'

আমি তাকে কি করে বলি, 'আপনি একজন ঘুষখোর। আমি ঘুষখোরের বন্ধু হতে চাই না। আপনার পারিবারিক ডাক্তার আছি, সেটা ঠিক আছে। আপনার বাড়ির লোকের চিকিৎসা আমি করব। কিন্তু অন্তত বন্ধু পরিচয় দেবেন না।' এসব না বলে সকলে যা করে আমিও তাই করলাম। চা খাইয়ে হাসি মুখে বিদায় দিলাম। বললাম, 'না কোন কিছুই নয়। কয়েকটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে আছি তাই।'

হরিহরণবাবু চলে গেলেন বটে তবে সন্দিগ্ধ চিত্তে গেলেন। বলেও গেলেন, 'আপনার কথায় আমি খুশি হলাম না। আপনাকে একদিন বলতেই হবে- কি আপনার সমস্যা।' তাকে কি করে বলি, 'সমস্যা আমার নয়। সমস্যা আপনার।'

হরিহরণবাবু চলে যাওয়ার পর আমি ভাবতে শুরু করলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই ভাবনা আর অনেকগুলো সমাধান আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে লাগল। ভাবনাটা হল, লোকটা অসৎ-ঘুষখোর। লোকটা যথেষ্ট ধনী। টাকা পয়সার অভাব নেই। সম্পত্তিও অনেক। তাহলে লোকটা ঘুষ নেয় কেন? ঘুষের পয়সা তো ভোগ করতে পারবে না এ জীবনে। ঘুষ না নিলেই তো পারে। ঘুষ ছাড়াই লোকের কাজ করে দিক। মনে শান্তি আসবে। সুখ আসবে।'

অনেকগুলো সমাধান মাথায় চক্কর দিতে শুরু করল- যখন জানতাম না লোকটি ঘুষখোর লোকটা তো তখন আমার বন্ধু ছিল। আমি যদি লোকটিকে আমার মনের কথা খুলে বলি তাহলে কি হতে পারে?

এক) লোকটি আমার সঙ্গে আর নাও মিশতে পারে। সেখানে সমস্যা কি? আমিই তো মিশব না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাহলে হারানোর কিছু নেই।

দুই) লোকটিকে যদি বলি, 'দেখুন আপনি ঘুষ নেন, এটা আগে জানতাম না। তাই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে আপনি আপনার অফিসে ঘুষ ছাড়া কারও কোন কাজ করে দেন না। তাই আপনাকে এড়িয়ে চলছি। আপনাকে ভালো লাগছে না। আপনি যদি ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে পারেন তাহলে আমি পূর্বের মত আপনার সঙ্গে মিশতে পারি।'এর ফলে কি হতে পারে? হরিহরনবাবু আমাকে মিথ্যে বলবেন, 'কে বলল আপনাকে এসব? আমি জীবনে কোনদিনই ঘুষ নেইনি।' অথবা বলবেন, 'ঠিক আছে আমি আর ঘুষ নেব না।'

আমি মনস্থির করলাম হরিহরনবাবুকে সব বলব। সব বলব অকপটে। তারপর তার বক্তব্যের ধারা বুঝে আমি আমার গন্তব্যের দিকে এগোবো। আমি জানতাম

উনি আবার আসবেন আমার বাড়িতে এবং আসলেনও একদিন। মাঝের এ ক'টা দিন আমি কোন যোগাযোগ করিনি তার সাথে। এবার এসে বেশ নরম সুরেই বললেন, 'কি হল ডাক্তারবাবু? আমার বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে, আপনি কেন আসছেন না। আপনি আমাকে বলুন, আপনার হঠাৎ কেন এ পরিবর্তন? কি আপনার সমস্যা?'

চা খেতে খেতে তাকে সব খুলেই বললাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে যা বললেন আমি তো একেবারে থ'। বুঝলাম এখানেও সেই একই কারণ- সুখ। সেই সুখ নামক আবেগের প্রভাব বা সুড়সুড়ি। তিনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আমি ঘুষ নিলে সুখ পাই। সেজন্যই ঘুষ ছাড়া কারো কিছু করতে পারি না। আমি বললাম, 'আপনি কি জানেন যে আপনি একটা অপরাধ করছেন? এটা জেনেও আপনি অপরাধটি করে যাচ্ছেন? তা ছাড়া আপনি নিজেও জানেন যে আপনার যত টাকা বা সম্পত্তি আছে বাকি জীবন বসে খেলেও ফুরবে না। আপনার ছেলেটিও ভালো চাকরি করছে। আপনি সরকার থেকে বেতন পাচ্ছেন, ছেড়ে দিন এসব।'

হরিহরনবাবু বললেন, 'আপনি যা যা বললেন সে সব আমি জানি, ডাক্তারবাবু। সবই মানি, সবই বুঝি। ওই যে বললাম, ঘুষ নিলে সুখ পাই।' অদ্ভুত যুক্তি তার।

এবার আমি তার ব্যাধি চিহ্নিত করলাম। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে আরও অনেকের ব্যাধি নিরাময়ে কাজে লাগিয়েছিলাম। হরিহরণবাবুর কথাই বলি। তাকে বললাম, 'আপনি এসব ছেড়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'জানেন ডাক্তারবাবু, অনেকবার আমি ভেবেছি এসব ছেড়ে দিই। কিন্তু যখন কারও কোন কাজ করে দিচ্ছি, ফাইলে সই করছি তখনই ভাবি ঘুষ নিতেই হবে। নাহলে মনের মধ্যে একটা অস্থির ভাব শুরু হয়ে যায়। ঘুষ নিয়ে তবে সই করে দিই। ঘুষের টাকা দিয়ে আমি কি কাজে লাগাব সেটা ভাবি না। এর থেকে পারিনি বেরিয়ে আসতে। এ এক অদ্ভুত সুখের মজা।'

আমি তাকে এবার চেপে ধরলাম, 'আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রাখতেই হবে। আপনি আগামী এক সপ্তাহ কোন ঘুষ নেবেন না। কথা দিন।'

হরিহরণবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বললাম, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' চা আর মুখে তুললেন না হরিহরণবাবু।

যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'ডাক্তারবাবু, একটা কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেললেন আমাকে। এমন কথা কেউ আমাকে বলেনি। সকলে হাসি মুখে ঘুষ দেয় আর কাজ করে দিই। তখন থাকে আমার বুক ভর্তি সুখ। আমি বলতে পারছি না আপনার কথা রাখতে পারব কিনা। সত্যিই কথা দিতে পারছি না আপনাকে।'

আমি তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। দীপালীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পাই। বলল, 'কি হল তোমার? এভাবে চুপচাপ বসে আছো? তোমার কি কোন সমস্যা?'

আমি ওকে বললাম, ‘কেন, আমাকে কি দেখে তাই মনে হচ্ছে যে আমি কোন সমস্যায় পড়েছি? সমস্যা তো একটা আছেই।’ মনে পড়ছে হরিহরণবাবুও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘ডাক্তারবাবু, আপনার কি কোন সমস্যা? আমাকে এড়িয়ে চলছেন?’

দীপালীকে সব খুলে বললাম। আমি বললাম, ‘দেখি লোকটার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারি কি না।’

দীপালী বরাবর আমাকে এসব কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে। বলল, ‘দেখ, তুমি তো ভালো কাউন্সেলিং করতে পার। লোকটিকে যদি ভালো করতে পার।’

বোঝালাম দীপালীকে, ‘লোকটির মনটা আসলে ভালো, কারণ তিনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে এক ধরণের সুখ কাজ করছে। সুখের প্রভাব থেকে বেরোতে পারছেন না। আমি ঠিক পারব তাকে পথে আনতে।’

পরদিন সন্ধ্যায় হরিহরণবাবু আমার বাড়ি এসে হাজির। দরজা ঠেলে উপরে দোতলায় সোজা আমার ড্রয়িংরুমে এসে বসে পড়লেন আর একটু গলা চড়িয়ে দীপালীকে বলছেন, ‘ম্যাডাম, একটু চা খাওয়াবেন? খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।’ সব কিছু অন্যরকম লাগল আমার । আমি বললাম, ‘কি হয়েছে বলুন তো। এমন হাঁকডাক দিচ্ছেন যেন বড়ো একটা কিছু করে এসেছেন।’

হরিহরণবাবু বলে চললেন, ‘বড়ো একটা কিছু তো অবশ্যই ঘটেছে। তাই অফিস থেকে বাড়ি না গিয়ে সোজা আপনার বাড়ি চলে এলাম। আর আপনার বাড়িতে চা খেতে খেতে সুসংবাদটি দেব। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আমি আজ সারাদিন কারো নিকট থেকে একটি টাকাও ঘুষ নিই নি এবং সকলের সব কাজ করে দিয়েছি হাসি মুখে। কুড়ি বছরের চাকুরি জীবনে যা পারিনি আপনার একটি অনুরোধে তা পেরেছি।’ লোকটির চোখে মুখে একটা মহা তৃপ্তির চিহ্ন দেখতে পেলাম।

বললাম, ‘আপনি খুশি তো? একটা আলাদা সুখ পেলেন কিনা?’ নির্মল হাসি হরিহরণবাবুর মুখে, কোন কথা নেই।

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছে। হরিহরণবাবু বললেন, ‘ম্যাডাম, বলতে বলতেই চা হাজির? কি ব্যাপার বলুন তো?’ দীপালীও এক কাপ চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, ‘আমরা এসময়ে চা খাই, সে তো আপনি জানেন। চা বানানোই ছিল, তার থেকে আপনাকে এক কাপ দিলাম।’

হাসতে লাগলেন হরিহরণবাবু। আজকে তার হাসিতে অনেক সুখ মেশানো ছিল তা আমার ও দীপালীর দৃষ্টি এড়ায়নি। আলাদা সপ্রতিভ চেহারা তার। নিজেই নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন এমনভাবে যেন আজ তার নবজন্ম হয়েছে।

আমি তাকে বললাম, ‘তাহলে আজ একটা নতুন সুখের সন্ধান পেলেন। আগামি কাল থেকে এই নতুন সুখেই অবগাহন করবেন আশা করি।’

এই হচ্ছে সুখ। কত অদ্ভুত রকমে মানুষের সুখ আসে। হরিহরণবাবু ঘুষ খেলে সুখ পেতেন এই গতকালও। টাকার বিশেষ প্রয়োজন নেই তবুও ঘুষ খেতেন সুখের জন্য। আর আজ সারাদিন ঘুষ না নিয়ে সুখ পেয়েছেন।

অপরদিকে যাদের সুখানুভূতি কম বা দুঃখবাদী তাদের শারীরিক সুস্থতাও কম। তারা নানা রকম রোগ ব্যধিতে ভোগে। মানসিক দুশ্চিন্তা, একাকীত্ব ও অবসাদে ভোগে এরা। দেখা গেছে এদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই শুধু কম নয় এদের আয়ুষ্কালও কম। কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই মানসিক জোরের উপর নির্ভর করে।

একটা ঘটনার কথা বলি। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এক বার্ষিক সম্মেলন। অনেক ডাক্তার ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। অনেক ওষুধ কোম্পানি স্টল দিয়েছিল। সারাদিন বেশ কয়েকটি সেমিনার ছিল। সন্ধ্যায় সম্মেলন শেষ হল। সম্মেলন শেষে ডেকরেটরের লোকজন আসলে ওদের সব জিনিসপত্রের হিসাব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল একটি টেবিলক্লথ মিলছে না। আই এম এর সকল কর্মিদের জিজ্ঞাসা করা হল। কেউ বলতে পারছে না, টেবিল ক্লথ কোথায় গেল। একটা সামান্য টেবিলক্লথ, খুব বেশি দামও না। কে নেবে, কোথায় বা যাবে?

পরদিন আই এম এর সিসিটিভি এর রেকর্ডিং চালালাম এবং যা দেখলাম একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। দেখলাম দুপুরের দিকে সকলে যখন দুপুরে লাঞ্চ করতে গেছে তখন বড়ো হলঘরের একটা টেবিল থেকে একজন যুবক টেবিল ক্লথটি উঠিয়ে নিচ্ছে এবং সেটি ভাঁজ করে তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। আমাদের সম্পাদক ডাঃ বিশ্বজিৎ সাহাকে সিসিটিভি রেকর্ডিং দেখালেই বলে উঠল, 'এতো একটা বড়ো ওষুধ কোম্পানির (ওষুধ কোম্পানির নাম উহ্য রাখলাম) মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ।'

তখন ওই কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজারের নিকট ফোন করলাম। তার হোয়াটসঅ্যাপে ওই রেকর্ডিংয়ের অংশটুকু পাঠিয়ে দিলাম। তিনি দেখেই চিনতে পারলেন এবং বলে উঠলেন, 'স্যার, এতো আমাদের কোম্পানির রথিন (নাম পরিবর্তিত)। আপনাদের ওখানেও এই কান্ড করেছে?' আমি তাকে বললাম, 'কেন ও এরকমই চুরি করে নাকি?' এরিয়া ম্যানেজার বললেন, 'স্যার, দেখুন আমাদের এটা নামকরা মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানি। রথিন আমাদের কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ। ভালো বেতন পায়। শিক্ষিত ছেলে। তবু কেন যে এমন চুরি করে। কত বুঝিয়েছি। চুরি করে ধরা পড়েছে অনেকবার। কত অসম্মানিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। শুধু আমাদের এত বড়ো কোম্পানিতে চাকরি করে বলেই ওকে অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে। আর নয়। ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওকে ভালো করতে পারলাম না।'

আমি বললাম, ‘কাল ওকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।’ সঙ্গে সঙ্গে উনি বলে উঠলেন, ‘না স্যার, চিন্তা করবেন না। আপনাদের টেবিল ক্লথ আগামিকালই পেয়ে যাবেন। আর রথিনকে আমরা চরম শাস্তি দেব। আই এম এর প্রোগ্রামে এমন কাণ্ড করেছে। সকল ডাক্তারের কাছে আমাদের মাথা হেট হয়ে গেল। ওকে কালই চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করব।’

আমি এরিয়া ম্যানেজারকে বললাম, ‘মাথা ঠাণ্ডা করুণ। আমি ওর শাস্তির কথা বলছি না। আপনি রথিনকে কাল সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আমি ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলব শুধু। কোন রকম বকাঝকা বা গালিগালাজ করব না।’

পরদিন ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এরিয়া ম্যানেজার সোজা আমার চেম্বারে হাজির। আমি ওদের দু’জনকে বসতে ইশারা করলাম। কিছু কাজ শেষ করে চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। ছেলেটি টেবিল ক্লথটি বের করে আমার সামনে টেবিলের উপর রাখল। খুব শান্ত নিচু গলায় রথিনকে বললাম, ‘রথিন, তোমাকে আমি খুব স্নেহ করি। তুমি কেন এটা করলে? এ তো সামান্য একটা টেবিল ক্লথ। কিইবা এর দাম?’

রথিন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, ‘স্যার, অন্যায় করেছি। ক্ষমা করে দিন এবারের মত। আর কোনদিন এসব করব না।’ আমি তাকে বললাম, ‘তোমার বাড়িতে সত্যিই কি টেবিল ক্লথের অভাব আছে? মনে হয় না। তুমি যে বেতন পাও, ডেকরেটরের এই সামান্য টেবিল ক্লথ তোমার ঘরে একেবারেই বেমানান হবে। জানি এ টেবিল ক্লথ তোমার বাড়ির কোন কাজের জন্য চুরি করোনি।’ রথিন বলল, ‘ঠিক বলেছেন স্যার।’

আমি বললাম, ‘আমি জানি, তুমি চুরি করে সুখ পাও। আর এই সুখের জন্যই তুমি চুরি কর। চুরির জিনিস তোমার প্রয়োজন নেই।’

ছেলেটি চুপ করে থাকে মুখ নিচু করে। কিছুক্ষণ পরে রথিন বলে ওঠে, ‘স্যার, আমি আমার প্রয়োজনের কথা ভেবে চুরি করি না। চুরি করে নিজের অজান্তে একটা সুখ পাই। সুখ পাই এই ভেবে যে, কেউ তো দেখতে পেল না। অথচ কাজটা করে ফেললাম। কেউ ধরতে পারল না।’

আমি বললাম, ‘জানো, এই কাজের জন্য তোমার চাকরি চলে যাবে? সভ্য সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে।’ আরও অনেকক্ষণ রথিনের সঙ্গে কথা বললাম। চেম্বার শেষ করে ওকে আমার বাড়ি নিয়ে গেলাম। একসাথে আমরা লাঞ্চ করলাম।’

এটা তার একটা অসুখ। সুখের জন্যই চুরি করে এরা। এই অসুখটির নাম ক্লেপটোম্যানিয়া (Kleptomania)।

এরা চোর নয়। এরা সুখ পাওয়ার জন্য চুরি করে। অনেক শিক্ষিত ভদ্র যুবক

যুবতীদের মধ্যে এই ক্লেপটোম্যানিয়া অসুখ দেখা যায়। ভিতরে কাজ করে সুখ নামক আবেগের কুপ্রভাব। এই অসুখ থেকে এরা বেরোতে পারে না। মানুষ এদের চোর ঠাউরে দুর্ব্যবহার করে। একজন চোরের সঙ্গে যেমন করা হয় এদের সঙ্গে তাই করা হয়।

অথচ ভালো কাউন্সেলিং করলেই এদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যায়। ভালো হওয়ার সুখের উপলব্ধি দিতে হবে আন্তরিক ব্যবহারের দ্বারা।

বলে রাখা ভালো, আমার কাউন্সেলিংয়ের ফলে এই রথিন ছেলেটিও ভালো হয়ে গেছে এবং আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বিয়ে করেছে ওর এক সহকর্মীকে। আমাকে তানিয়া অর্থাৎ ওর স্ত্রী ওর সামনেই হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জানেন স্যার, রথিন আমারও একটা কলম চুরি করেছিল। আমি ওকে এড়িয়ে চলতাম আর মনে মনে ভালোও বাসতাম।'

ওদের একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। কন্যার জন্মদিনের উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে আর ছবি তুলে সোস্যাল মিডিয়াতে পোষ্ট করেছে। সহানুভূতি আর সঠিক কাউন্সেলিং কত কি করতে পারে।

আমি সুখ নিয়ে অনেক ভেবেছি বিভিন্ন কৌণিক বিন্দু থেকে। সুখ একটি আশ্রয়। সুখ একটি উপলব্ধি। সুখ একটি মানস সরোবর। আপাত দৃষ্টিতে মনেই হতে পারে যে সুখ বৈষয়িক ক্রিয়া কর্মের সঙ্গে জড়িত। আদতে মোটেই তা নয়। সুখের হয়ত অঙ্কুরোদ্গাম হয় বিষয়ের নরম জমিনে কিন্তু তা দ্রুত স্থান বদল করে স্থান নেয় মনে। বিষয়কে পরিত্যাগ করে মনের গোলাপ বাগানে তার বিচরণ। সুখ চায় আরাম আর আয়েশের কোমল বিছানা।

কিছু পণ্ডিতের মত যে সুখবোধ অনেক সময়েই জীবনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। আরও কিছু চাওয়া বা পাওয়ার ইচ্ছেটাকে থামিয়ে দেয়। আমি সুখী। কি হবে এত অর্থ প্রতিপত্তি খ্যাতি নাম যশের পেছনে ফুটে, কিছুই সঙ্গে যাবে না, সবই তো ফেলে যেতে হবে- এ ভাবনা মানুষকে কর্মহীন গৃহবন্দি করে ফেলবে। এই তো বেশ আছি, সুখে আছি, এই ভাবনা উদ্দীপনাকে শিকল পরিয়ে দেয়। ওদের এত আছে তাও ওদের ঘরে সুখ নেই, আমার কিছু নেই তাও আমি বেশ আছি, সুখে আছি- এ কথা অনেক অকর্মণ্য মানুষের মুখে শোনা যায়। সুখ আসলে উন্নতি আঁটকে দেয়। পরিতৃপ্তি তৃষ্ণাকে থামিয়ে দেয়।

সকল পণ্ডিতদের মতে সুখ কর্মবিমুখ করে তোলে মানুষকে, শ্রমবিমুখ করে অলস করে ফেলে। তারা বলেন, সুখ হচ্ছে অলস মানুষের কাজ না করার একটা অজুহাত মাত্র। আমি তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাব না, কারণ তারা দেখছেন তাদের দৃষ্টিকোন থেকে, আমার ভাবনা আমার কৌণিক অবস্থান থেকে। কারো দেখাই নির্ভুল নয় আবার ভুলে ভরাও নয়। সকল চিন্তাই আপেক্ষিক।

এ সকল কথার পরও আমি বলব, আমি সুখেরও পক্ষে, আমি কাজেরও পক্ষে। এটা এক ধরণের মধ্যপন্থা। অথবা আমি এই ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী। সুখও চাই আর কাজও চাই। আর সেটা পাওয়াও যায় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা।

আমি আমার জীবন নিয়ে পরিতৃপ্ত, সুখী কিন্তু কর্মবিমুখ নই। আমি প্রচুর পরিশ্রম করতে পারি, পরিশ্রম করেছিও সারা জীবন। এখনও কাজ বা পরিশ্রম দেখে ভয় পাই না। আমার মনে হয় একটা মানুষ সুখ এবং শ্রমকে আলাদা রেখে যদি জীবন চালনা করে তবেই সে বিকশিত হতে পারে। তবেই সে অন্যদেরও উদ্দীপ্ত করতে পারে।

জীবন তো একটা গবেষণাগার আর গবেষক সে নিজেই। যে যেমন ভাবে গবেষণা করতে পারে। প্রতিটি মানুষই নিজেকে নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছে। ভাবনা আর কর্ম এই দুটিকে আলাদা অস্তিত্বে রেখে সমন্বিত করতে জানলেই জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে অন্যভাবে।

আমি আমার পাঠকদের একটি অনুশীলনের কথা বলব। ভালো থাকার অনুশীলন। আমি ভেবেছি—তত্ত্ব কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রয়োগিক বিষয় আমি বলব। যেমন সুখ মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় এক আবেগ। এটা ছাড়া জীবন বিস্বাদ। অথচ এটা কি দুষ্প্রাপ্য? সুখকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আবার লেপটে আছে মানুষের মনে মনে, মনের গভীরে। সারাদিন মানুষের হা-হতোস্মি-সুখ সুখ বলে বুক চাপড়ানি। এই দু'চারটি কথার পর আমার অনুশীলনী বললে আলোচনা সহজতর হবে।

সারা পৃথিবীর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত—

এক) যারা চির সুখী—তাদের বিষয় আসয় থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

দুই) যারা চির দুঃখী—তাদেরও বিষয় আসয় নেই বা আছে সেটা বড়ো কথা নয়, তারা দুঃখ আশ্রয়ী।

তিন) যারা সুখ ও দুঃখের ভারবাহী, দুটোই আছে তাদের, এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সুখানুভূতি সম্পূর্ণ মনে। মানুষ তার ভয়ানক বিপদের মধ্যেও একটি অনুশীলনে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটিয়ে সুখের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে পারে। এটি বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমে মনটাকে প্রস্তুত করতে হবে যে আমি সুখের অনুসন্ধানে নেমেছি, আমি গভীর সমুদ্রের এক ডুবুরি। ধ্যান বা যোগব্যায়াম মূলত একই ব্যাপার। একেবারে আসন পেতে ধ্যানে বসতে হবে তা নয়। পড়ার টেবিলে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক বা বিছানায় শুয়ে হোক এই অনুশীলন হতে পারে। মনোনিবেশ করা নিজের মনে। অনেকটা সময় অপচয় করতে হবে না।

পৃথিবীর সকল শব্দ ও ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিশ্ব থেকেই

নিজেকে বিযুক্ত করতে হবে, আর ভাবতে শুরু করা যে, 'আমি তো সত্যিই সুখী। আমার শরীর ও মনের বাইরে যা ঘটছে তার বাইরে আমার অবস্থান। আমি নিজেই নিজের অধীশ্বর, নিজ জগতের। দুঃখকে আমি স্পর্শ করতে দেব না। এই সামান্য অনুশীলন অনেক সুখ সরবরাহ করতে পারে মনকে। যখনই সময় পাওয়া যাবে এই মনের ব্যায়ামটুকু সেরে নেওয়া যায় সময়ের অপচয় না করেই। যে কোন বয়সেরই মানুষ এটা করতে পারে।

আমি এক সময় মনের এই ব্যায়াম বা ধ্যান বা যোগে আস্থা রাখতাম না। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে গিয়ে বুঝেছি অর্থ, বিষয়, সম্পত্তি ও উপকরণ স্থায়ী সুখভোগ মোটেই সরবরাহ করে না। সুখের উৎপত্তিস্থল হতে পারে বিষয়ে কিন্তু সে অর্জিত সুখের আবাস মনেই। তাই পরিযেবা দিতে হবে মনের গোলাপ বাগানে। পরিচর্যা করতে হবে মনের ভেতরের মন্দিরটিকে।

আমার পাঠকদের অনুরোধ করব আজ থেকেই শুরু করুন, সম্ভব হলে এখন থেকেই শুরু করুণ। এতে চিত্তচাঞ্চল্য দূর হবে। সুখের সন্ধান এখানেই মিলবে, অন্য কোথাও নয়। অন্য কোথাও সন্ধানে গেলে জুটবে অস্থিরতা, প্রতিযোগিতা আর হিংসা। আমি কিন্তু নিজের উন্নতিতে রাশ টানার কথা বলছি না। সেটা তো কর্ম। কর্মক্ষেত্র আর চিন্তনক্ষেত্র আলাদা।

সুখ আর কর্ম মিশিয়ে ফেললে হবে না। আমিও নিষ্কাম কর্মের পক্ষে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যে, সূর্যের কিরণের জন্যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্যে, সংসারের উন্নতির জন্যে এবং সর্বোপরি নিজের শরীর ও মনের শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই কর্ম, এবং অবশ্যই নিষ্কাম কর্ম। একমাত্র নিষ্কাম কর্মের চিন্তাই মানুষকে দুর্নীতির বাইরে রাখতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, যে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অবশ্যই নিষ্কাম কর্মের মাঝ দিয়েই অতিবাহিত হচ্ছে। নাহলে তো পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য থাকত না। অন্যায় দুর্নীতি অসৎ কাজে ভরে যেত। স্বার্থপর মানুষে অসহ রেষারেষি চলত। তা কিন্তু হয়নি।

আমরা পুলিশ প্রহরা ছাড়াই ভালো আছি ও বেঁচে আছি। অন্যায়ের প্রতিফলন বেশি হয়, তাই নজরে পড়ে। মূলত ভালো মানুষের সংখ্যা বেশি, কিন্তু ওরা যে নীরবে থাকতেই পছন্দ। ভালো মানুষ ঢাক ঢোল পেটাতে পছন্দ করে না। সুখী মানুষ সব সময় প্রচার বিমুখ। একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে আপনগণ্ডিতে মগ্ন থাকেন।

'আমি সুখী' এই ভাবনাটা একটা অনুশীলন, একটা দৈনন্দিন ব্যায়াম, একটা আরাধনা। অনুশীলন করতে করতেই একসময় সুখের আশ্রম খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে আশ্রমেই সুখ। সে আশ্রম যার যার মনে, অট্টালিকা হোক আর কুঁড়েঘর হোক। একটা শুকনো পাতা হোক আর প্রস্ফুটিত গোলাপ হোক, চোখের দৃষ্টিতেই মিলবে সুখ। তাই অনেক ছিন্নবস্ত্রের মানুষও সুখের সন্ধান পেয়ে যান। শুধু চোখ

আর মন সমুন্নত রাখতে হবে, সজীব রাখতে হবে।

Of all the different types of emotions, happiness tends to be the one that people strive for the most. Happiness is often defined as a pleasant emotional state that is characterized by feelings of contentment, joy, gratification, satisfaction, and well-being. Research on happiness has increased significantly since the 1960 within a number of disciplines, including the branch of psychology known as positive psychology.

This type of emotion is sometimes expressed through:

- Facial expressions such as smiling
- Body language such as a relaxed stance
- An upbeat, pleasant tone of voice

While happiness is considered one of the basic human emotions, the things we think will create happiness tend to be heavily influenced by culture. For example, pop culture influences tend to emphasize that attaining certain things such as buying a home or having a high-paying job will result in happiness. The realities of what actually contributes to happiness are often much more complex and more highly individualized.

People have long believed that happiness and health were connected, and research has supported the idea that happiness can play a role in both physical and mental health. Happiness has been linked to a variety of outcomes including increased longevity and increased marital satisfaction.

Conversely, unhappiness has been linked to a variety of poor health outcomes. Stress, anxiety, depression, and loneliness, for example, have been linked to things such as lowered immunity, increased inflammation, and decreased life expectancy.

দুঃখ
(Sorrow)

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, ‘মানুষের অতিরিক্ত সুখ অনেক সময় দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু অতিরিক্ত দুঃখ কখনো সুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায় না।’

দুঃখ অন্য এক ধরনের অতি স্পর্শকাতর আবেগ। অনেকেই হয়ত দুঃখকে আপাত ভাবে বলবেন সুখের বিপরীতমুখী আবেগ। আমার বিশ্লেষণে তা কিন্তু নয়। দুঃখ আসলে সুখের সহযাত্রী। পাশাপাশি বিরাজ করে মনের গভীরে, একই পুষ্পবনে সহাবস্থান সুখ আর দুঃখের। যে কোন সময়ে দুঃখ সুখের চেয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আর তখনই বলা হয় দুঃখ এসেছে।

দুঃখ বৈষয়িক কোন কিছুর অভাব থেকে সরাসরি আসে তা নয়। দুঃখ আসে অভাব বোধ থেকে। অভাবের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কোন কিছু কম পড়লেই অভাব হবে না।

কোন কিছুর সঙ্গে যখন একটা তুলনা হাজির হয় তখন বলা হয় অভাব আর তখনই দুঃখের উপস্থিতি। দুঃখ সকল সময়েই আপেক্ষিকতার নিরিখে নির্ধারিত হয়। দুঃখের মাত্রাও আপেক্ষিকতার সঙ্গে চলে।

ঢাকুরিয়ার কমলবাবু রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগে ঢাকুরিয়া অফিসে ষ্টেশন ম্যানেজার পদে চাকরি করতেন। একবার এক ব্যক্তি তার অফিসে এসে পাঞ্জাব লটারির এজেন্ট বলে পরিচয় দিলেন। কমলবাবুকে অনুরোধ করলেন তার থেকে একটা লটারির টিকেট কিনতে। কমলবাবু রাজি হচ্ছিলেন না। এজেন্ট অনেক অনুনয় বিনয় করল। কমলবাবু ভাবলেন, বেচারা গরিব মানুষ। এত করে বলছে, তা ছাড়া কুড়ি টাকাই তো মাত্র। রাজি হয়ে গেলেন। একটি লটারির টিকেট কিনলেন কুড়ি টাকায়।

একমাস পর লটারির ফলাফল বেরল দৈনিক খবরের কাগজে। কমলবাবু লটারির টিকিটটি হাতে নিয়ে ফলাফল মেলাতে বসলেন এবং অবাক হয়ে দেখলেন তার টিকিটের নম্বরের সংখ্যা একটির পর একটি পরপর মিলে যাচ্ছে এক লাখ টাকার নম্বরের সাথে। প্রতিটি নম্বরের সাথে সাথে তার সুখ বৃদ্ধি হতে থাকল।

আর যখনই দেখলেন তিনি এখনই একলক্ষ টাকা পাচ্ছেন। এক লাফে বহুগুণ সুখ বেড়ে গেল। আনন্দে আত্মহারা হলেন কমলবাবু। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন। গাড়ির ড্রাইভার আসলে তাকেও জড়িয়ে ধরলেন আনন্দের আতিশয্যে। ড্রাইভার তো অবাক তার সাহেবের অস্বাভাবিক আচরণে। তার সাহেবের হল কি! জিজ্ঞেস করলে বললেন কমলবাবু, 'জানিস না আমি এক লাখ টাকার লটারি পেয়েছি?'এটাই সুখ। হঠাৎ কিছু পাওয়া। কষ্ট করে ধীরে ধীরে কিছু পেলে এই আনন্দ হবে না, এই সুখ নামক বস্তু আসবে না।

যাই হোক কমলবাবুর তখন সুখের অনুভূতির চূড়ান্ত অবস্থান। আর এই চূড়ান্ত সুখের অবস্থান থেকেই শুরু হল তার দুঃখ অনুভূতির আগমনী।

দ্রুত মোহ ভঙ্গ হতে লাগল তার। তিনি অনেক টাকার মালিক, ছেলে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী রাধারানী সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই এক লাখ টাকা কিছুই নয় কমলবাবুর কাছে। এখন তিনি ফিরে এলেন তার হিসেব নিকেশের মধ্যে। পাশে দাঁড়ানো গরিব ড্রাইভার এবার কিছু আশা করল তার কাছে। ড্রাইভারকে বললেন, 'তুই অনেক দিন আমার সঙ্গে আছিস। যা তোকে এর থেকে পাঁচ হাজার টাকা দেব। কাজের লোকটি কিছু চাইল, 'বাবু আমাকে কি দেবেন?'- 'আচ্ছা, তোকেও পাঁচ হাজার দেব।' বাড়ির বাগানের মালি কাচুমাচু করে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'বাবু, আমার মেয়েটার বিয়ে'। - 'আচ্ছা, তোর মেয়ের জন্য একটা কানের দুল করে দেব আমি'—বাবু বললেন। ঘরে গিন্নির কাজের মাসি বলল, 'জামাইবাবু, এক লাখ টাকা পেয়েছেন। আমিও কিছু চাই এবার।'

—'আচ্ছা, তোকেও ভালো কিছু একটা দেব।' এভাবে সংখ্যা বাড়ল, চাহিদা বাড়ল।

কমলবাবু ভাবলেন এই পাওয়া লটারির টাকা তিনি নিজে রাখবেন না, নিজের কাজে ব্যবহার করবেন না, দান করবেন, বিলিয়ে দেবেন নিজের মানুষদের মধ্যে। সেখানেও সুখ। ইতিমধ্যে সকলকে কিছু দেওয়াও শুরু করলেন। সেই দানের টাকা তার লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেল। তখনও তিনি অবশ্য লটারির টিকিটটি ভাঙাতে যাননি। একদিন পাঞ্জাব লটারির পার্ক স্ট্রিটের আঞ্চলিক অফিসে গেলেন। যথাযথ ভাবে ফরম পূরণ করে লটারির টিকিটটি জমা দিয়ে লক্ষ টাকা দাবি জানালেন। তাকে বলা হল, এখনি তো টাকা পাবেন না, আগে সব মিলিয়ে দেখি। তাকে সাতদিন পর আসতে বলা হল। লোকটি বিরক্ত হলেন। ভেবেছিলেন, এখনই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ টাকা পাবেন। তার দুঃখ শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফিরলেন। আজ অফিস কামাই করলেন। আবার একদিন আসতে হবে ছুটি নিয়ে। অফিসে যা চাপ—বিদ্যুৎ বিভাগ বলে কথা।

এভাবেই দুঃখ নামক আবেগের জন্ম হল। সাতদিন পর ভদ্রলোক কমলবাবু

লটারি অফিসে গেলেন কিন্তু টাকার কোন খবর নেই। উপরন্তু শুরু হল জেরা, 'কোথায় এ টিকিট পেলেন?' বললেন যে তার অফিসে এসেছিল একজন এজেন্ট, তার থেকে কিনেছেন।

অফিস থেকে বলল, 'এটা জাল টিকিট।' কমলবাবু প্রথমে একটু চেঁচামেচি হম্বিতম্বি করলেন। লটারি অফিসের ম্যানেজার তাকে বললেন, 'আপনি কোথাও যাবেন না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। জাল টিকিট পাওয়া গেছে আপনার কাছে।'

কমলবাবু এবার নরম ভাবে বলল, 'আমার কি দোষ বলুন? আমি তো কিনেছি আপনাদেরই একজনের থেকে।'

—'সে হবে না। আমাদের কোম্পানির জাল টিকিট আপনার কাছে পাওয়া গেছে।' পুলিশ এসে ভদ্রলোককে থানায় নিয়ে গেল। কোর্টে চালান করল। দু'দিন পর জামিন নিয়ে বাড়ি ফিরলেন কমলবাবু।—এভাবেই সুখ আর দুঃখের পাশাপাশি অবস্থান। এভাবেই দুঃখের বিবর্তন। এভাবেই সুখের পরিবর্তন দুঃখের মরুভূমিতে।

দুঃখ একটা আবেগ যেটা হচ্ছে একধরনের অতৃপ্তি, নিরাশা, বিষণ্নতা ও নিরুৎসাহ অবস্থা দ্বারা ক্রিয়াশীল। যেখানে হতাশা আর হতোদ্যম প্রতিক্রিয়া মনের উৎসাহকে সেখানে অবদমিত করে এবং দুঃখ অবস্থার সৃষ্টি করে।

অন্যান্য আবেগের মতই সকল মানুষই দিনের কোন না কোন সময়ে দুঃখের অনুভবের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে। প্রতিটি মানুষ সারাদিন কোন না কোন সময় দুঃখের আবেগে অবগাহন করবেই।

জীবনের কিছু কিছু সময়ে দুঃখ এতটাই চেপে ধরে যে বেরিয়ে আসতে পারে না। দুঃখের ভয়াবহতায় মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে। কেউ কেউ অবশ্যই দুঃখকে জয় করে অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। নিজের ভিতরের দুঃখ থেকে নিজের মনকে টেনে বের করে আনতে গেলে একটা শক্তি লাগে। একটি পদ্ধতি লাগে। সেটা হচ্ছে প্রথমে নিজের মনটাকে দ্বিখণ্ডিত করা। তারপর মনের একটি ভাগ অপর ভাগকে শাসন করে দুঃখকে বিতাড়ন করতে সক্ষম হবে।

এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি। নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হতে হয়। নিজেই নিজেকে প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন করাতে হয়। উত্তর দিতে হয় আর মুক্তির পথ খুঁজতে হয়। পথ বেরিয়েও আসে। যাদের মনের জোর যত বেশি তারাই তত দ্রুত মনের ভিতরের এই দ্বন্দ্বকে সৃষ্টি করতে পারে ও স্বমুক্তির পথ বের করতে পারে। দুঃখকে নিয়ন্ত্রন করা একটা খেলা। মনের ভিতরে মনের সাথে খেলা। এই খেলায় জিততে পারলে প্রচুর আনন্দও জোটে। বেশির ভাগ মানুষই দুঃখকে বিতাড়নের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে না পেরে মানসিক অবসাদের শিকার হয়।

মানসিক অবসাদ থেকে অনেক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। উচ্চ রক্তচাপ,

ক্ষুধামান্দ্য, নার্ভের অসুখ, অস্থিরতা প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি পায়। অবসাদের কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এমনকি আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।

দুঃখের ভার বহন করতে না পেরে অবসাদের কারণে আত্মহত্যা বা অপরাধ সংঘটিত করা দুটি প্রক্রিয়াই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নেয় মানুষের মন।

দুঃখ বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পায়, শারিরিক ও মানসিক ভঙ্গিমার মধ্যে। যেমনঃ

- মনের চনমনে ভাব চলে যাওয়া
- হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়া
- শরীরে ক্লান্তিভাব
- সকল কাজের থেকে নিজেকে নিবৃত করা
- নিদ্রাহীনতা
- দুর্ব্যবহার করা
- হঠাৎ অমায়িক ব্যবহার শুরু করা
- খিটমিটে আচরণ করা
- কান্না
- অদ্ভুত হলেও দুঃখে মানুষকে হাসতেও দেখা যায়

সর্বশেষ পরিস্থিতিটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। দুঃখ মানুষকে কাঁদায়। কিন্তু দুঃখে যখন কোন মানুষ হাসতে থাকে বুঝতে হবে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে চলেছে এই মানুষটির মধ্যে। বিশেষ কোন একটি দুঃখ তার মধ্যে এমন আরও কিছু আবেগকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেলেছে যা তার সমস্ত কিছু বিকল করে দিয়েছে। তাই আকস্মিক কোন দুঃখে কাউকে হাসতে দেখলেই সতর্ক হতে হবে। প্রয়োজনে মানসিক চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যেতে হবে।

দুঃখ আবেগ মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করতে পারে যে সে কাউকে খুন করতে পারে, কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। আত্মহত্যা করতে পারে।

দুঃখ এমন এমন অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়েছে যা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঘর ছেড়ে গোপনে কোথাও বেরিয়ে চলে যেতে পারে। এমন হয়েছে যে আর কোনদিন সে ঘরে ফেরেনি। এমনভাবে স্মৃতিভ্রম ঘটেছে যে সে তার পূর্বের সব ভুলে গেছে দুঃখের আকস্মিকতায়।

আবার কিছু দুঃখের আবেগ মানুষের চরিত্র বদলে দিতে পারে, এত ক্ষমতাশালী দুঃখ। কোন অপরাধপ্রবণ মানুষের জীবনে এমন একটি দুঃখজনক কিছু ঘটল যে সে তার সকল অপরাধপ্রবণতা ত্যাগ করল এবং সাধু পুরুষ হয়ে গেল। এমন উদাহরণ প্রচুর আছে যে বিপথগামী মানুষ একটি দুঃখজনক ঘটনার আকস্মিকতায় আমূল বদলে গিয়েছে।

রাজাবাজারের শান্ত ছেলে রফিক। পাড়ার সকলে ওকে খুব ভালো ছেলে বলেই জানে। রাজাবাজারের এক বিবাহিতা তরুণী সালমা বেগম খুন হয়ে গেল একদিন। সালমার স্বামী পুলিশকে জানায়, ‘রফিক সালমার প্রাক্তন প্রেমিক। ওকেই সে সন্দেহ করে।’ কাদের আরও জানায় - সে বাড়িতে না থাকলে রফিক ওর বাড়ি এসে সালমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করত। সালমার স্বামী কাদের জানায় যে সে একবার দুপুরে কাজ থেকে একটু আগেই বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে সে রফিককে দেখে ফেলে সালমার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায়। সে সালমা ও রফিক- দুজনকেই প্রচণ্ড মারধর করে সেদিন।

এরপর থেকে সালমাই রফিককে ওর বাড়ি আসতে নিষেধ করে। কাদের বলে যে রফিক ও সালমার মেলামেশা তবুও বন্ধ হয়নি। কাদের রফিককে একবার শাসায়। রফিককে সাবধান করে দেয়, ‘রফিক, তুই সরে যা সালমার থেকে। ফল ভালো হবে না।’ সালমা রফিকের গোপন মেলামেশা চলতে থাকে বলে কাদেরের সন্দেহ।

সালমার মোবাইল কল লিস্ট ঘেঁটে পুলিশ রফিককেই সন্দেহ করে। তরুণীটি খুনের আগে সালমার মোবাইলে অনেকবার রফিক কথা বলেছিল। যদিও রফিক পুলিশকে বলেছিল, ‘স্যার, বিশ্বাস করুন- আমি সালমার সাথে কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আমি সালমাকে খুন করিনি।’ খুনের মামলায় পুলিশ ওকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর সালমাকে খুনের মামলায় অনেক বছর হাজতবাস করে রফিক। হাজতে থাকা অবস্থায় ওর মায়ের মৃত্যু হয়।

প্রায় পাঁচ বছর মামলা চলার পর প্রমাণের ওভাবে রফিক বেকসুর খালাস পায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রফিক বাইরে বেরিয়ে বাড়ি এসে মায়ের শোকে কাতর হয়ে পড়ে। বন্ধুরা ওকে এড়িয়ে চলতে থাকে। রফিক সকলকে বলে, ‘আমি সালমাকে খুন করিনি। আমি সালমাকে ভালোবাসতাম। তোমরা বিশ্বাস কর। সালমাকে ওর স্বামী কাদেরই খুন করেছে।’

কেউ ওর কথা শোনেনি। এতদিন পরে শুনেই বা কি হবে। সালমাকে হারিয়ে, মাকে হারিয়ে দুঃখ চেপে ধরে রফিককে। ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া হতে লাগল রফিকের। এক বছর পর জেনেছিলাম রফিক ওখানকার এক বড়ো দুষ্কৃতী এখন। আরও দুই একবার জেলেও গেছিল রফিক। রফিক একদিন গুলি খেয়ে মারা গেল। ওর লাশ নেওয়ার মানুষ পাওয়া যায়নি হাসপাতালের পোষ্টমর্টেম থেকে।

এমন অনেক মানুষ হঠাৎ এমন এক দুঃখের সম্মুখীন হয় যে তার পর থেকে অপরাধী হতে শুরু করে, এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুঃখ পেল আর এরপর একদিন দুষ্কৃতী হয়ে গেল- এমন ঘটনা ভুরিভুরি। নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, অনেক খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়ল। পৈতৃক সম্পত্তি

বিক্রি করা শুরু করল। তারপর নিঃস্ব হয়ে পড়ল। একদিন দেখা গেল রেলস্টেশনে পড়ে আছে। সেখান থেকেই তার শেষ যাত্রা ঘটেছিল। একটি দুঃখ একটি মানুষকে কোন সীমানায় নিয়ে যেতে পারে , আবেগ যে কি পরাক্রমশালী একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

দুঃখ নিয়ে নানা মনিষীর নানা ব্যাখ্যা মিলেছে তাদের নিজের মতো করে। কিন্তু দুঃখ এক মহারহস্যের আবেগ- এক মহাসাগর। প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারে পৃথিবীতে।

আজকাল অনেকে দুঃখকে ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছেন, অথবা তাদের এটাই লাইফস্টাইল। দুঃখকে আঁকড়ে থাকতেই যেন ভালো লাগে কারো কারো। আমার ভীষণ পরিচিত অনাদিনাথবাবু। কোন অভাব নেই। ছেলেটা তার মানুষ হয়ে গেছে। ভালো চাকরি করে কলকাতা কর্পোরেশনে। আর এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বেশ ভালো ঘরে। আমরা দেখে শুনে যা বুঝি ভালোই আছেন অনাদিনাথবাবু, দুঃখে থাকার কোন কারণই নেই। হাসি খুশি ঠাট্টা মশকরা ভালোই বোঝেন এবং করেনও মাঝে মাঝে।

কিন্তু যখনই জিজ্ঞেস করি, 'অনাদিনাথবাবু, কেমন আছেন?'

নির্ঘাত তাকে বলবেন, 'আর কেমন আছি! ভালো নেই, ডাক্তারবাবু। যা চলছে চারিদিকে। ভালো থাকা যায়, আপনিই বলুন না?' এটুকু বলেই থেমে থাকবেন না। এরপর একগাদা ফিরিস্তি দেবেন ভালো না থাকার। দুঃখ যেন তার চিরসাথি।

অথচ অদ্ভুত অনাদিনাথবাবু যে কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করেন তাও না। তিনি কিন্তু সব সময়ই হাসি খুশি মুডে থাকেন। কিন্তু মুখে তার এক কথা, 'না, আমি ভালো নেই। দুঃখ আমার সব সময়ের সঙ্গী।' দুঃখ ছাড়া অনাদিনাথবাবুর ঘুম আসে না, পেটের ভাত হজমও হয় না।

এজন্যই একথা বলা যে, দুঃখ শুধু কিছুর অভাব থেকে আসে না, অনুভূতি থেকে আসে দুঃখ। কেউ শীতের চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে রাখেন দুঃখের আমেজ। সত্যিই অদ্ভুত এ পৃথিবী আর অপূর্ব অদ্ভুতএ পৃথিবীর মানুষ।

দুঃখের ধরণ ও গভীরতা নির্ভর করে দুঃখের উৎসের উপরে এবং কিভাবে লোকটি দুঃখকে মোলাকাত করছে তার উপর। একই ধরনের দুঃখে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কেউ তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে আবার কেউ দুঃখের সাগরে ডুবে যেতে থাকে। প্রত্যেকের মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে কে দুঃখকে কি ভাবে নেবে।

অনেক সময়েই দুঃখ মানুষকে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয় অথবা সে একাকি থাকতে পছন্দ করে। ক্রমে ক্রমেই মানুষটি অসামাজিক হয়ে যায়। কেউ কেউ

এমনও হয় যে দুঃখ নিয়েই বসবাস করতে ভালোবাসে। সে দুঃখী- এটা ভাবতেই শুরু করে দেয়। দুঃখ একটা নেশার মত হয়ে যায়। আগেই বলেছি - কারও কারও দুঃখ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। 'আমি দুঃখী'- এটা বলে গর্ববোধ করে এমন মানুষ অনেক দেখা যায়। সেই একমাত্র দুঃখী আর পৃথিবীর সকল মানুষ সুখী- এটাই ভাবে। একটা হীনমন্যতা তাদের গ্রাস করতে থাকে। তারা ভালো নেই, এই কথা দিয়ে অন্যের সাথে কথা শুরু করে অথবা তাদের দিন শুরু করে।

আবার অতি বিনয়ী মানুষেরা নিজের দুঃখবোধকেই প্রাধান্য দেন এই ভেবে যে দুঃখই সকলের চরাচর। সুখ কোথায়? সে তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে অদেখা ধুমকেতু। বিনয় প্রকাশ করতে তাই এরা আশ্রয় নেয় দুঃখ কথার। তারা ভাবে, 'আমি দুঃখী' এটা বললে হয়ত বিনয় প্রকাশ পাবে। এরা ভাবে এ কথার ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য থাকবে না। আর এই কথা বলতে বলতে সত্যিই এরা হাসতে ভুলে যায়। অন্যেরা হাসলেও তিনি দুঃখ পান। এরা এতই একা হয়ে যান যে তার দুঃখের ভাগিদার খুঁজে পান না। এদের দৃষ্টিতে পৃথিবী এক অকল্যাণের রাজত্ব। দুঃখ কষ্ট ভয়ে ভরা পৃথিবী।

অনেক সময়ে দেখা যায় দুঃখ একটা সংক্রামক ব্যাধি হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ ভাবনার সাথে সংসারে নিকটজনকে জড়িয়ে ফেলে। নিজের দুঃখকে অন্যের সাথে জড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা এমন ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে যে দুজন একসঙ্গে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে, খুনও হতে পারে।

সমীরণ ও ইন্দ্রাণী দুই ভাই বোন। ইন্দ্রাণী বড়ো। সমীরণ নামী স্কুলের শিক্ষক। দিদি ইন্দ্রাণী উচ্চ শিক্ষিতা। দিদি ইন্দ্রাণীও ভাল চাকরি করেন কলকাতা সল্টলেক-সেক্টর ফাইভে। ইন্দ্রাণী বিয়ে করেননি। সমীরণবাবুর বিয়ের পরের বছর তার বাবা মারা যান। ভাই, ভাইয়ের বউ আর ইন্দ্রাণী তিনজনের সংসার। বাবার মৃত্যুর একবছর পর সমীরণবাবুর একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। সমীরণবাবু দিদিকে খুব ভালোবাসতেন। এক কথায় সুখের সংসার ওদের। আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্ট। পৈত্রিক বাড়ি ওদের। কিছুদিনের মধ্যে ইন্দ্রাণীর ক্যান্সার ধরা পড়ল। লিভার ক্যান্সার। অনেক ডাক্তার দেখাল। কলকাতার টাটা মেমরিয়াল, চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতাল- অনেক দৌড়াদৌড়ি করল সমীরণ ওর দিদিকে বাঁচানোর জন্য। চার মাসের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে যখন শেষ কথা বলে দিল তখন সমীরণ দিদিকে বাড়ি নিয়ে আসল। শেষের সেই মুমুর্ষ অবস্থায় সমীরণ ওর দিদির সাথেই থাকত। সেবা শুশ্রূষা সেই করত। দিদির বিছানায় ঘুমতো। দিদির সকল পরিচর্যা নিজ হাতে করত- খাওয়ানো, পরানো, স্নান করানো- সব। ওর দিদি মারা গেল যেদিন, সেদিন সমীরণ যেন পাথর হয়ে গেল।

দুই দিন কিছু খেল না, জল স্পর্শ পর্যন্ত করল না। খুব ভেঙে পড়ল সমীরণ। সমীরণের স্ত্রী সুলতা সমীরণকে অনেক বোঝাল। সমীরণ সারাদিন চুপ করে থাকে। অফিসেও যায় না। সুলতাকে দিয়ে অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। বাড়ীতেই দিদির ঘরে একলা থাকে। শুধু বলতে থাকে, 'আমার দিদি নেই, এ পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই।'

রোজ ওর স্ত্রী সুলতাকে বলত, বোঝাত, 'দেখ, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।' সুলতা ওর স্বামীর ব্যথা বুঝতে শুরু করল। সমীরণের দুঃখ সুলতার মধ্যে সংক্রামিত হতে লাগল। এমন হতে লাগল ওরা দুজনে ক্রমেই দুঃখের মধ্যে ডুবে যেতে থাকল। এমনকি সুলতার কোলের ছোট্ট শিশুটির যত্ন আত্তিও কমে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে সুলতা ওর স্বামীর কষ্টের অংশীদার হয়ে পড়ল গভীর ভাবে। সমীরণ ওর স্ত্রীকে বোঝাতে লাগল যে ওর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

যে দিদি এত ভালোবাসত, তাকে ছাড়া জীবন অর্থহীন, এ পৃথিবীটা একেবারে শূন্যয় ওর কাছে। এর চেয়ে জীবন শেষ করে দেওয়াই ভালো।

দুঃখ এতটাই প্রকট আকার ধারণ করল যে প্রায়ই সমীরণ আত্মহত্যার কথা বলত সুলতাকে। সুলতা প্রথমে বোঝাল সমীরণকে, 'কোলে একটা ছেলে আছে। আত্মহত্যা করা কি ঠিক হবে?' সুলতা এসব কথা ওর বাবা মাকেও বলেছিল।

তারাও এসে সমীরণকে বুঝিয়ে গেল, 'সবাইকেই একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে। তাই বলে তুমি আত্মহত্যা করবে কেন? এসব কথা ভুলেও মনে এনো না বাবা, তোমার একটা ছেলে আছে, সুলতা আছে। এদের কথা ভাববে না?'

চুপ করে থাকে সমীরণ। কিছুদিন পর একদিন সকালে প্রতিবেশীরা দেখল সমীরণদের বাড়িতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশ এসে ওদের ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে দুই ঘরে দুই জন ফ্যানের সঙ্গে গলায় কাপড় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। শিশুটির নিথর দেহ বিছানায় পড়ে আছে। বোঝা গেল শিশুটিকে হত্যা করার পর একে একে দুইজন আত্মহত্যা করেছে।

দুঃখ কেমন সংক্রামক যে এমন করুন পরিণতি ডেকে আনতে পারে। দুঃখ-সেতো ছিল শুধু সমীরণের। সুলতা মরতে চায়নি। স্বামীর দুঃখে সহমরণে গেল নিজের শিশুটিকে খুন করে। এমন হৃদয়বিদারী ঘটনা বিরল হলেও ঘটছে। এ ঘটনাটি আমার বলার উদ্দেশ্য- দুঃখ এমন মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সতর্ক থাকা উচিত সকলকেই।

একের দুঃখ অন্যজন না বুঝেই বহন করা শুরু করে শুধু প্রিয়জন বলে। নিজেকে ক্রমেই শেষ করে দেওয়ার খেলায় দুঃখের এ এক ভয়ানক চক্র। সে জন্য

পরিবারের কোন সদস্যের কোন দুঃখকে উপেক্ষা করতে নেই। সে যে বয়সেরই হোক না কেন- শিশু, কিশোর বা পূর্ণ বয়স্ক। বরং মমত্ব দিয়েই দেখা উচিৎ। কারও ভিতরে মারণ দুঃখ বাসা বেঁধেছে কিনা কে জানে।

মনে রাখতে হবে অন্যের দুঃখ দূর করতে হবে তার দুঃখের বাইরে অবস্থান নিয়ে। তার দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে, তার দুঃখ নিজের মধ্যে যেন সংক্রমণ না ঘটে। অন্যের দুঃখে সমব্যথী হও কিন্তু তার দুঃখের ভিতরে প্রবেশ করো না। তার দুঃখের কম্বল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিও না। সমাধান তো হবেই না বরং বিপদ ত্বরান্বিত হবে।

Sadness is a type of emotion often defined as a transient emotional state characterized by feelings of disappointment, grief, hopelessness, disinterest, and dampened mood.

Like other emotions, sadness is something that all people experience from time to time. In some cases, people can experience prolonged and severe periods of sadness that can turn into depression.

Sadness can be expressed in a number of ways including:

- Dampened mood
- Quietness
- Lethargy
- Withdrawal from others
- Crying

The type and severity of sadness can vary depending upon the root cause, and how people cope with such feelings can also differ.

Sadness can often lead people to engage in coping mechanisms such as avoiding other people, self-medicating, and ruminating on negative thoughts. Such behaviours can actually exacerbate feelings of sadness and prolong the duration of the emotion.

Sadness is an emotional pain associated with, or characterized by, feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. An individual experiencing sadness may become quiet or lethargic, and withdraw themselves from others. An example of severe sadness is depression, a mood which can be brought on by major depressive disorder or persistent depressive disorder.

A large amount of research has been conducted on the neuroscience of sadness. According to the American Journal of Psychiatry, sadness has been found to be associated with increases

in bilateral activity within the vicinity of the middle and posterior temporal cortex, lateral cerebellum, cerebellar vermis, midbrain, putamen, and caudate. Jose V. Pardo has his M.D and Ph.D and leads a research program in cognitive neuroscience. Using positron emission tomography (PET) Pardo and his colleagues were able to provoke sadness among seven normal men and women by asking them to think about sad things. They observed increased brain activity in the bilateral inferior and orbitofrontal cortex. In a study that induced sadness in subjects by showing emotional film clips, the feeling was correlated with significant increases in regional brain activity, especially in the prefrontal cortex, in the region called Brodmann's area 9, and the thalamus. A significant increase in activity was also observed in the bilateral anterior temporal structures

আতঙ্ক
(Fear)

আতঙ্ক বা ভয় একটি তীক্ষ্ণফলার মত ধারাল আবেগ। যে কোন বিপদ ঘটার পূর্বে ওই বিপদের একটা কাল্পনিক চিত্র মানুষের মনের মধ্যে অবিরত চিত্রিত হতে থাকে যা মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এটাই ভয় এটাই আতঙ্ক। বিপদ ঘটার পূর্বেই বিপদের ছায়া শরীরে ও মনে যে ছাপ ফেলতে শুরু করে সেটাই ভয়।

আমার দৃষ্টিতে ভয় মানুষ বা যে কোন প্রাণীর একটা প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি। আতঙ্ক মানুষকে চিন্তার খোরাক যোগায় যার ফলে বিপদের যত রকম আশঙ্কা থাকে সবগুলিই ধারনায় নিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি আশঙ্কার বিপক্ষে যুক্তি স্থির করে। প্রতিরোধের যুক্তি। যদি বাগযুদ্ধ হয় তবে সে সব খণ্ডনের যুক্তি প্রস্তুত করে। যদি শারীরিক আক্রমণ বা ক্ষতির বিষয় হয় তবে গ্রহণ করে শারীরিক প্রস্তুতি।

আতঙ্কের চারটি ক্ষেত্র। যেমন-

১) মানসিক—

- অসম্মানিত হওয়ার ভয়
- সামাজিক ভাবে হেয় হওয়ার ভয়
- সন্তান বা স্ত্রী বা নিকটজনের হেনস্থা হওয়ার ভয়

২) শারীরিক—

- রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়
- কারও হাতে খুন হওয়ার ভয়
- অথবা শারীরিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার ভয়
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়

৩) অর্থনৈতিক -

- সম্পত্তি নষ্টের চিন্তা
- অর্থনাশের চিন্তা
- চাকুরীচ্যুত হওয়ার ভয়

- চোর ডাকাতের ভয়

৪) দেশ, ধর্ম ও সমাজ

- দেশ ত্যাগের ভয়
- ধর্ম নষ্টের চিন্তা
- জোর করে ধর্মান্তর করণের ভয়
- দেশ ধ্বংসের চিন্তা
- সমাজ নষ্টের চিন্তা
- সমাজ উৎখাতের চিন্তা
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়

বেশির ভাগ সময় ভয়মানুষের উপকার করে তার কারণ ভয়ের ফলে মানুষ সতর্ক হতে পারে, সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

আবার অতিরিক্ত প্রস্তুতিও অতিসতর্কতা গ্রহণ করতে গিয়ে নানান রকম বিপত্তিও বাধিয়ে ফেলে। ভয়ের অন্য একটা দিক হচ্ছে, ভয়ে মানুষ কুঁকড়ে যায়, সঙ্কুচিত হয়ে যায় ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন সব রকম কাজ কর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সাহস হারিয়ে ফেলে—মনোবল তলানিতে ঠেকে।বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নিজের প্রতি, নিকটজনের প্রতিও। ভয় আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয় তখন।

একবার ডেবিট কার্ড থেকে টাকা লোপাট হতে লাগল অনেকের, বিশেষ করে যারা এটিএম থেকে টাকা তুলত তাদের। সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে একটা আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছিল এর পিছনে। তারা এটিএম কার্ডের ক্লোন অর্থাৎ নকল এটিএম কার্ড তৈরি করে টাকা তুলে নিত। নিধুভূষণের ভয় ঢুকল তার ডেবিট কার্ডের ক্লোন বানিয়ে কেউ তার টাকা তুলে নেবে। বারবার মানি ব্যাগ থেকে ডেবিট কার্ডটি গোপনে বের করে দেখত। যখন তখন এটিএম মেশিনে গিয়ে লাইন দিত। আর ব্যাল্যান্স চেক করত, দিনে দুই তিনবারও পরীক্ষা করত। কারও মোবাইল কল আসলে ধরত না। কি জানি ফোন রিসিভ করলে যদি সব তথ্য হাতিয়ে নেয়। তবে তো ফতুর বানিয়ে ছাড়বে।

সকলকে অবিশ্বাস করতে শুরু করল। কেউ কথা বলতে আসলে তাকে এড়িয়ে চলত, কথা বলত না। ভাবত, ‘কিছু বেফাঁস কথা বললেই বিপদ।’ কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে আর এটিএমের টাকা লোপাট হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে নিধুভূষণ তার স্ত্রীর সঙ্গেও কম কথা বলা শুরু করল, বাইরে থাকলে স্ত্রীর ফোন ধরত না। স্ত্রী রুমা সন্দেহ করতে লাগল, ‘কেন তাকে এড়িয়ে চলছে নিধুভূষণ?’ তার স্ত্রী রুমা গোপনে নিধুভূষণের উপর নজরে রাখতে লাগল। পাড়ার ছেলেরা

রুমাকে বলেছিল, 'বউদি, নিধুদা দিনে দুই তিনবার করে এটিএম থেকে টাকা তোলে।' রুমা নিজেও খবর নিয়ে জানল সত্যিই তো, ওর স্বামী দিনে কয়েকবার এটিএমে ঢুকছে। আর টাকা তোলা ছাড়া এতবার এটিএম এ ঢোকার কি কারণ থাকতে পারে।

রুমা জিজ্ঞেস করল একদিন, 'কি গো তুমি দিনে এতবার এটিএম থেকে টাকা তুলছ। ব্যাপারটা কি? কাউকে সব দিয়ে দিচ্ছ নাকি?' নিধুভূষণ পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করল, 'কি যে বল। আমি রোজ এটিএম থেকে টাকা তুলব কেন? আমি এটিএমের কাছেই যাই না।'

রুমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধল, 'ও মিথ্যে বলছে কেন? টাকা তুলে কাকে দিচ্ছে কোন মেয়েছেলের পাল্লায় পড়ল না তো?' নিধুভূষণ মিথ্যে বলছে এর ফলে রুমার মনে আরও ভয় ঢুকল। সংসারে অশান্তি শুরু হল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে নিধুভূষণের প্যান্ট সার্ট গোপনে পরীক্ষা করত, শুঁকে দেখত , কোন রকম গন্ধ লেগে আছে কি না। দেরি করে বাড়ি ফিরলে একশো গণ্ডা প্রশ্ন, 'কেন দেরি হল? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কোথায় টাকা খরচা করে আসলে? কাকে টাকা দিয়ে আসলে? ভাবো আমি কিছু বুঝি না? সব বুঝি।'

রুমা ওর দিদিকে ফোন করল, 'দিদি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোদের জামাই বাবু কোন মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছে। তাকে সব টাকা পয়সা দিয়ে দিচ্ছে। আমার কি হবে?' ফোনে দুই বোন একপ্রস্থ কান্নাকাটিও করে নিল। ওর দিদি রুমা এসে একদিন নিধুকে বোঝাল। নরমে গরমে কিছু শোনাল নিধুভূষণকে।

রুমার বান্ধবী তরুলতাকে রুমা ফোন করে সব বলল। তরুলতা নিধুভূষণকে ফোন করল, 'জামাইবাবু, আপনার বয়স হয়েছে। এখন এ সব কি শুনছি। এ সব ছাড়ুন। রুমা খুব ভালো মেয়ে। ওকে বঞ্চিত করবেন না। ওকে কষ্ট দেবেন না।'

নিধু কি করে বোঝাবে যে ওর ভয় ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রুমা একদিন আমার কাছে এলো। রুমা আর নিধুভূষণ দুজনই আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। ওদের যে কোন সমস্যা হলে আমার সাথে আলোচনা করে। আমি ওদের পারিবারিক চিকিৎসক। এ রকম সব পারিবারিক চিকিৎসকের বেলায় এমন ঘটে। পারিবারিক চিকিৎসক সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পারিবারিক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়।

রুমা বাইরে রিসেপসানিস্টের ঘরে বসে ছিল, সি সি ক্যামেরায় দেখলাম। ভাবলাম কোন অসুখ করেছে হয়ত, ওকে আমার ঘরে ডাকলাম। কিন্তু রুমা বলল যে সকল রোগী শেষ হলে পরে কথা বলবে। সকল রোগী দেখা শেষ হলে রুমা আমার ঘরে ঢুকল। খুলে বলল ওর আতঙ্কের কথা।

বলল, 'আপনার বন্ধু নিধুভূষণ রোজ এটিএম থেকে টাকা তুলছে। আমার সন্দেহ ও হয়ত কাউকে টাকা দিয়ে দিচ্ছে।' এও বলল, 'আপনার বন্ধু হয়ত কোন

মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছে। আপনি আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।'

আমি রুমাকে বললাম, 'চিন্তা করো না। আমি কথা বলব।' রুমা যাওয়ার সময় এও বলে গেল, 'আমি যে আপনার নিকট এসেছি আর এসব বলেছি, ওকে বলবেন না।'

আমি পরদিনই নিধুভূষণকে ফোন করে আমার চেম্বারে আসতে বললাম। চেম্বারে আসলে আমি ওকে বললাম, 'কি রে নিধু, তোর নাকি অনেক টাকা। রোজ এটিএমে জমা রাখছিস।' ও আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'না রে, তুই তো আমার বন্ধু। তোকে সব বলতেই পারি।' এর পর ওর আতঙ্কের কথা সব বলল। বলল, 'যে ভাবে এটিএম জালিয়াতি হচ্ছে, যে কটা টাকা আছে তা যদি লোপাট হয়ে যায়, আমার কি হবে বল? কত বড়ো ক্ষতি হতে পারে আমার?' ওকে বললাম, 'আচ্ছা , তোর বউ যদি ভেগে যায় কেমন হবে?'

-'কেন কেন, আমার বউ ভাগবে কেন? বউ ভাগলে মরে যাব, বন্ধু। এ সব কেন বলছিস? রুমা তোকে কিছু বলেছে?'

-'না না, রুমা কি বলবে? আমি তোর কাছে জানতে চাইছি, তো বউ ভাগলে তোর কত ক্ষতি?'

-'তা হলে তো আমার সব গেল। এই সময়ে ও ছাড়া আমার আর আছে কে বল?'

-'তোর ব্যাংক থেকে তো টাকা হারায়নি। আতঙ্কে আছিস যে তোর টাকা লোপাট হতে পারে। এখনও কোন ক্ষতিই হয়নি। এদিকে তুই বউ হারাতে বসেছিস আতঙ্কে।'

-'রুমা সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে না? আমার মান সম্মান সব গেল।'

-'তোর জন্যেই তোর মান সম্মান যাচ্ছে। তোর টাকা হারালে তো আমাদেরও টাকা হারাতে পারে। আমাদের কারও হারায়নি। কিন্তু তোর সংসারে অশান্তি চলছে। সামনে তোর বিপদ। ও সব আতঙ্ক ছাড়। তোর কিছু হবে না। আতঙ্ক না ছাড়লে সব যাবে। সেটা টাকা হারানোর চেয়ে বেশি।'

নিধুভূষণ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,'তুই আমার অনেক উপকার করলি ভাই। আমি শুধু টাকা নিয়েই ভেবে চলেছি।'

-'তুই গিয়ে সব সত্যি কথা রুমাকে খুলে বলবি। আমি রুমাকে চিনি। ও খুব ভালো মেয়ে। সব বুঝবে। তোর টাকা কেউ তুলে নেবে না।'

জানি এখনি পাঠক জিজ্ঞেস করবেন, 'এরপর? এরপর কি হল?'

সিনেমার শেষ দৃশ্যে যা হয়- নিধুভূষণ ও রুমা আবার সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

আমি শুধু নিধুভূষণের আতঙ্ক দূর করেছিলাম। আপনা আপনি রুমার আতঙ্ক

দূর হয়ে গেল। একটি আতঙ্ক অন্য আতঙ্ককে আমন্ত্রণ করে। একটি আতঙ্ক দূর হলে ওপরটিও আপনা থেকেই বিদায় নেয়।

ভয়ের ভালো ও মন্দ দুটি দিকই আছে, সেটা নির্ভর করে তার মানসিক প্রস্তুতির উপর। আবার বারে বারে একই রকম আতঙ্কের সম্মুখীন হলে লোকটির মধ্যে এক প্রকার প্রতিরোধ শক্তি জন্মায় যা তাকে ভবিষ্যতে ওই আতঙ্কের মোকাবেলার ক্ষমতা এনে দেয়।

আতঙ্ক মানুষের -

- নাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়
- হৃদযন্ত্রের কাজ বাড়িয়ে দেয়
- মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়
- মুখ শুকিয়ে যায়
- শরীরের শক্তি কমিয়ে দেয়
- অথবা অসম্ভব শক্তি বেড়ে যায় (এর ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি)
- চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়।

হরিহরন একদিন জঙ্গলে ঘুরছিল। হঠাৎ সে একটা বাঘের সামনে পড়ে গেল। তখন হরিহরণের দু'রকম অবস্থা হতে পারে-

- প্রথমত- এতই ভয় পেল যে সে তার চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল। কি করতে হবে বুঝতেই পারছে না। মাথা কাজ করছে না। ভয়ে সেখানেই নেতিয়ে পড়ল আর বাঘ তাকে টেনে নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল।
- দ্বিতীয়ত, ভয় পেয়ে হরিহরণ পালানোর মনস্থির করল এবং দেরি না করে মুহূর্তে বসিদ্ধান্তে দৌড় শুরু করল। সামনে একটা বড়ো গাছে উঠে পড়ল। হরিহরণ প্রাণে রক্ষা পেল।

এমন অনেক দেখা গেছে কোন বাড়িতে রাতে চোর ঢুকেছে। বাড়ির লোকজন টের পেয়েছে যে বাড়িতে চোর এসেছে। তারা চিৎকার শুরু করল। চোর একদৌড়ে ছাদে চলে গেল এবং পাড়ার লোক আসার আগেই ছাদ থেকে একলাফ দিয়ে পালাল। অথচ একটি সাধারণ মানুষ এমনকি ওই চোরও পরদিন স্বাভাবিক ভাবে ওই ছাদ থেকে লাফ দিতে পারবে না। এটাই ব্যাখ্যা আতঙ্ক মানুষের পেশিতে অস্বাভাবিক শক্তি এনে দেয়।

আতঙ্ক এক সংক্রমক আবেগ। একের থেকে অন্যের মধ্যে, অন্যের থেকে অন্যদের মধ্যে, এ ভাবে একটি এলাকায় বা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর ফল হতে পারে মারাত্মক। একটি আতঙ্ক থেকে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে, অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। এমনও দেখা গেছে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ তার কাজ কর্ম ছেড়ে সম্পূর্ণভাবেই ঘরে আবদ্ধ করে রাখছে নিজেকে।

টালিগঞ্জের অরুণবাবু শুনলেন যে তার এক পিসতুতু দাদা লিভার ক্যান্সারে মারা গেছে। সেই লোকটি খোঁজ নিতে শুরু করলেন, তার ওই পিসতুতু দাদার লিভার ক্যান্সারে কি কি লক্ষণ ছিল। তার পিসতুতু দাদার মৃত্যু সংবাদের পর থেকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে ভয় শুরু হল যে, লিভার ক্যান্সারের লক্ষ্মণের সঙ্গে তার শরীরেরকোন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কিনা। অরুণবাবু গুগল সার্চ করতে লাগলেন। পড়ে পড়ে মেলাতে লাগলেন নিজের সঙ্গে। অরুণবাবু বার কয়েক পিসতুতু দাদার বাড়িতে গেলেন।

আতঙ্ক বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। সে বাড়ির লোকজনের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে তার আত্মীয়ের লক্ষণ গুলোর মধ্যে ছিল- খাবারে অনিচ্ছা, বমি বমি ভাব, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা, পেটে অস্বস্তি, পেটে ব্যথা ইত্যাদি। তখন তিনি তার শরীরেও একই রকম লক্ষণ খুঁজতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি খুঁজে পেতে থাকেন তার শরীরে লিভার ক্যান্সারের লক্ষণের। কখনও ভাবেন তার পেট ফাঁপছে, তার লিভারটা বড়ো হয়ে যাচ্ছে। কখনও দেখেন পেটে ব্যথা করছে। কখনও ভাবেন তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন। তা হলে কি তার লিভার ক্যান্সার হয়েই গেল! ব্যাস লোকটির মধ্যে শুরু হল লিভার ক্যান্সারের আতঙ্ক। দিন রাতের আতঙ্ক।

অরুণবাবু একই ভয় নিয়ে সারাটা দিন কাটান। কখনও পেটে হাত দিয়ে বসে আছেন, কখনও বা ল্যাবরেটারিতে যাচ্ছেন, কখনও রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন, কখনও আলট্রাসনোগ্রাফি করাচ্ছেন। কখনও হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন। কখনও কবিরাজী- কখনও আয়ুর্বেদ। কিছুদিন পরপর ডাক্তার পাল্টাচ্ছেন। ক্রমেই খিটমিটে হয়ে যাচ্ছেন। তার দুশ্চিন্তা, 'কেউ তার রোগ ধরতে পারছেন না অথচ তার শরীরে লিভার ক্যান্সারের রোগের অনেক মিল। ল্যাবরেটারি গুলো যাচ্ছে তাই, কেউ ঠিকমত পরীক্ষা করে না। কোন ডাক্তার তাকে ভালো করে দেখছে না', ইত্যাদি। এভাবে আতঙ্ক তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে। কাজ কর্ম করতে পারছেন না। কাজে ভুল হচ্ছে।

এর পরের ধাপ আরও খারাপ—এবার দেখা দিল শারীরিক উপসর্গ। এই মানসিক অস্থিরতা থেকে সৃষ্টি হল নানান শারীরিক অসুখ। শুরু হল অনিদ্রা, অনিদ্রা থেকে ক্ষুধামান্দ্য-খাবারের অনিচ্ছা। খাবারের অনিচ্ছা থেকে- অপুষ্টি, ওজন কমতে লাগল। যা খান তাও হজম হয় না। রক্তাল্পতা দেখা দিল। দুশ্চিন্তা কমাতে ধূমপান শুরু করলেন অরুণবাবু। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ধূমপানের কারণে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমল। সর্দি কাশি লেগেই থাকে। অল্পে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন।

সেই সঙ্গে তার মৃত্যু ভয়—যে কোন সময়ে লিভার ক্যান্সারে মারা যাবেন।

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি তাকে চেপে ধরল। তার একই চিন্তা কোন ডাক্তার তার অসুখের কিনারা করতে পারছেন না। একবার প্রচণ্ড ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কোন অ্যান্টিবায়টিকে সাড়া দিচ্ছে না। যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলে মাল্টি ড্রাগ রেজিট্যান্স। এরপর শরীরের একে একে সকল অঙ্গ বিকল হতে থাকে। একেও চিকিৎসা পরিভাষায় বলে মাল্টি অর্গান ফেলিওর।

এরপর জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সরানো হল আই সি ইউতে, শেষে ভেন্টিলেশনে। পরিশেষে ডেথ সার্টিফিকেটে সিলমোহর। কোন চিকিৎসা তাকে বাঁচাতে পারেনি। অথচ মৃত্যু এত দ্রুত নিকটে আসার কারণ ছিল না।

আমি অনেক রোগীকে দেখেছি, শরীরে কোন অসুখ নেই একবার আমাকে দেখাচ্ছেন, দুদিন পর আর এক ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। তারপর সত্যিই একটা অসুখ বাঁধিয়ে বসেন এই আতঙ্ক থেকে। এমন কোন ডাক্তার নেই যাদের এমন ঘটনা ভুরি ভুরি দেখতে হয় না। যখনই বলেছি, 'দেখুন, আপনার শরীরে কোন অসুখ নেই। কোন ওষুধ লাগবে না।' তিনি পরদিন থেকে আর আমার নিকট আসলেন না। অন্য আর এক ডাক্তারকে গিয়ে বলবেন, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন তো। কেউ আমার রোগ ধরতে পারছেন না। অনেক আশা নিয়ে আপনার নিকট এলাম। অন্তত আমার রোগটা কি বলে দিন।'

অরুণবাবুর এ ঘটনাও বিরল নয়। কাড়ি কাড়ি টাকা ধ্বংস করছেন। আতঙ্ক কোথায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে পাঠক নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন।

এমনও দেখা যায় কেউ কেউ আতঙ্কের পরিস্থিতি পছন্দ করে। বার বার ঘন ঘন আতঙ্কের উৎসে প্রবেশ করতে চায়। আতঙ্ক যেন তাদের উপভোগের বস্তু। এরা মানুষের নিকট আতঙ্কের গল্প বলে। অন্যকে আতঙ্কের গল্প বলে এরা উপভোগ করে। আতঙ্কের গল্প বলতে বলতে এক সময়ে এই উপভোগ তাকে চেপে ধরে। অন্য মানুষদেরও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

কোন কারণ ছাড়াই রানাঘাটের নারায়ণবাবু একদিন বাড়ি এসে সন্ধ্যাবেলায় তার স্ত্রীকে বললেন, ' শুনেছ, বেশ কিছুদিন আমার ভয় হচ্ছে আমাকে মনে হয় কেউ আমাকে খুন করতে পারে।'

স্ত্রী মালতীদেবী বললেন, 'তোমাকে আবার কে খুন করতে যাবে? তুমি কি কারো কোন ক্ষতি করেছ? না তোমার কোন শত্রু আছে?'

—'আমিও তো তাই ভাবছি, আমি তো কারো কোন ক্ষতি করিনি। আমাকে কেন কেউ খুন করতে যাবে। কিন্তু মালতী, আমার আতঙ্ক হচ্ছে , আমাকে কেউ খুনের পরিকল্পনা করছে, মনে হচ্ছে কেউ যদি আমাকে ভেবে থাকে যে আমি তার কোন ক্ষতি করেছি?'

—'ও তোমার অকারণ আতঙ্ক, মনের ভুল। তোমার হঠাৎ কেন এ চিন্তা মাথায় এল? বল, কেন তোমাকে কেউ খুন করতে যাবে?'

—'শোন, এখন আমরা এই যে ভালো আছি, কিছু টাকা পয়সা হয়েছে, ছেলেটা ভালো লেখা পড়া করছে এই হিংসাতেই আমাকে কেউ খুন করতে পারে।'

—'ধ্যাৎ। তোমার মত এমন ভালো অবস্থা অনেকেরই আছে। আর এই জন্যে কেউ কাউকে খুন করে?'

—'তুমি বুঝতে পারছ না। একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছেই আমার বিরুদ্ধে আমার ভাইদের মধ্যেই কেউ আমাকে খুন করতে পারে।'

রানাঘাটের নারায়ণবাবুর সারাক্ষণ এই চিন্তা পেয়ে বসেছে , ওকে কেউ খুনের পরিকল্পনা করছে। রাতে ঘুম নেই। মাঝ রাতে ঘরের সব আলো জ্বেলে বাড়ির বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলেন। সকলকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন নারায়ণবাবু। সন্দেহ করতে লাগলেন যাকে তাকে। মালতীকে বললেন আবারও এই কথা। পরে অন্য কানে গেল। সেখান থেকে নারায়ণবাবুর ভাইদের কানে গেল। তারা নারায়ণবাবুর থেকে দূরে থাকতে লাগল।

নারায়ণবাবুর ছোটো ভাই তারক একদিন এসে বলল, 'দাদা, তুমি নাকি বলেছ, আমরা তোমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছি। এটা কি সত্যি ? তুমি বলেছ এ কথা? যদি তুমি বলে থাক এটা ভারি অন্যায়।'

নারায়ণ বাবু অস্বীকার করলেন। কিন্তু এরপর তার আতঙ্ক আরও বেড়ে চলল। ভাইয়েরা মুখ দেখা দেখি বন্ধ হল। নারায়ণবাবু থানায় একটা ডায়েরি করে আসলেন যে কেউ তাকে খুনের ছক কষছে। বাড়িতে পুলিশ আসল। ভাইদের জিজ্ঞাসাবাদ করল। পুলিশ সকলকে সাবধান করে গেল। নারায়ণবাবুর ছোটো ভাইয়েরা বেজায় চটে গেল বাড়িতে পুলিশ এসেছে বলে। পাড়ার লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল। কেউ কেউ আবার সত্যি সত্যি শত্রুতার গন্ধ খুঁজে পেল। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে নারায়ণবাবুর ভাইয়েরা নারায়ণবাবুকে খুনের ছক কষছে।

নারায়ণবাবুর বনগাঁর শ্বশুরবাড়ি, অন্যান্য আত্মীয় বাড়ি, পাড়ার ক্লাবে খবর গেল যে ভাইয়েরা নারায়ণবাবুকে খুন করতে পরিকল্পনা করছে। কথার শাখা প্রশাখা গজাতে লাগল। অনেকে এসে নারায়ণবাবুকে সাবধানে থাকতে বলে গেল। কেউ বলে গেল, 'রাতে বেরবেন না।' কেউ বলে গেল, 'একা বেরবেন না।' নারায়ণবাবুর তৈরি আতঙ্ক নারায়ণবাবুকেই চেপে ধরল।

শেষে অল্প দামে বাড়ি বিক্রি করে রানাঘাট ছেড়ে বারাসাতে লারিকা আবাসনে ছোটো একটা ফ্লাট কিনে চলে আসলেন। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে স্রেফ আতঙ্কের

কারণে অচেনা পরিবেশে জীবন কাটাতে লাগলেন।

মানুষের দৃশ্যমান শত্রুর চেয়ে মনের শত্রু বেশি ভয়ঙ্কর। দৃশ্যমান শত্রুর মোকাবেলা করা যায়। অদৃশ্য শত্রুর মোকাবেলা সম্ভব নয়, সে শুধু একতরফা আক্রমণ করে চলে এবং অসম্ভব রকমের ক্ষতিসাধন করে।

Fear is a powerful emotion that can also play an important role in survival. When you face some sort of danger and experience fear, you go through what is known as the fight or flight response. Your muscles become tense, your heart rate and respiration increase, and your mind becomes more alert, priming your body to either run from the danger or stand and fight. This response helps ensure that you are prepared to effectively deal with threats in your environment.

Expressions of this type of emotion can include:

- Facial expressions such as widening the eyes and pulling back the chin
- Attempts to hide or flea from the threat
- Physiological reactions such as rapid breathing and heartbeat

Of course, not everyone experiences fear in the same way. Some people may be more sensitive to fear and certain situations or objects may be more likely to trigger this emotion.

Fear is the emotional response to an immediate threat. We can also develop a similar reaction to anticipated threats or even our thoughts about potential dangers, and this is what we generally think of as anxiety. Social anxiety, for example, involves an anticipated fear of social situations.

Some people, on the other hand, actually seek out fear-provoking situations. Extreme sports and other thrills can be fear-inducing, but some people seem to thrive and even enjoy such feelings.

Repeated exposure to a fear object or situation can lead to familiarity and acclimation, which can reduce feelings of fear and anxiety. This is the idea behind exposure therapy, in which people are gradually exposed to the things that frighten them in a controlled and safe manner. Eventually, feelings of fear begin to decrease.

বিতৃষ্ণা
(Disgust)

(বীতশ্রদ্ধা বা বিরাগ বা বিতৃষ্ণা)

যে মৌলিক ছয়টি আবেগ রয়েছে তার মধ্যে বিতৃষ্ণা বা বিরাগ এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পণ্ডিত একম্যান একই কথা বলেছেন 'বীতশ্রদ্ধা মানুষের এক সহজাত মৌলিক আবেগ, এই আবেগ কখনও অন্য কোন আবেগের উপর নির্ভর করে জন্ম নেয় না। এই আবেগ মানুষের আদি সৃষ্ট আবেগ।' চার্লস ডারউইন বলেছেন, 'বিতৃষ্ণা হচ্ছে এমন একটা অনুভূতি যা মানুষের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করে।'

'অপছন্দ', এটাই বিরাগের মূল ভিত্তি। এটা তো ঠিক পৃথিবীর কোন কিছুই নিখুঁত নয়। কোন না কোন ত্রুটি বা খুঁত থাকবেই। আর এই আদি ভাবনাটি কিছু মানুষের অন্তরে যদি গেঁথে বসে এবং সে ব্যক্তির অন্য সকল ভাবনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন সেটাই বিতৃষ্ণা। এদের উপলব্ধি হল, পৃথিবী বড়োই কুৎসিত। কদর্য দ্রব্যে ভরা এ পৃথিবী। এদের দৃষ্টিতে সততা সুন্দর অকৃত্রিম বলে কিছু নেই। এরা সকলের সততা, নৈতিকতা ও চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

বিরাগ বা অশ্রদ্ধার মূল কথাই হল- সব কিছুতেই একটা ত্রুটি ধরতেই হবে । এরা ভাবেন যা আছে এর চেয়ে ভালো হতে পারত। মনে হবে যেন সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ, সব কিছুতেই খুঁত। তা সে কোন কথা হোক, গল্প হোক, মানুষ হোক, মিষ্টি হোক, সুখ হোক, দুঃখ হোক, ছবি হোক, গান হোক, ভালোবাসা হোক, দান হোক, দয়া হোক, ফুল হোক বা ফল হোক। সন্ধান করলে ত্রুটি তিনি পাবেনই। ত্রুটি পেয়ে যে চুপ করে থাকবেন তা তো হতে পারে না। এটা নিয়ে সে তার মত প্রকাশ করবেন বিরক্তি সহকারে। এই বিরক্তি সহকারে মত প্রকাশই হল বিতৃষ্ণা বা বিরাগ। এটাই ওই মানুষটির বাহাদুরি।

বিতৃষ্ণা নিয়ে দিবারাত্র চর্চা করতে গিয়ে তিনি বিতৃষ্ণার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। বিতৃষ্ণার সঙ্গে একটা আপোষে আসেন। তাকে সঙ্গী করে নেন, সঙ্গী করে বিচরণ করেন। বিতৃষ্ণা তার একটা অস্ত্র হয়ে যায় যে অস্ত্র সে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। যত্রতত্র প্রয়োগ করেন। অনেক মানুষের বিরক্তি বা অপছন্দ হতে

পারে কোন কিছুতে কিন্তু তারা সব সময় সেটা প্রকাশ করেন না। হয়ত চুপ করে থাকেন কিন্তু তার ভিতরে একটা বিরাগ বা বিতৃষ্ণা ক্রিয়া করে সকলেরই।

হাওড়ার রামবাবু তার অনেক দিনের বন্ধু শ্যামবাবুকে সস্ত্রীক তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন একদিন। ইচ্ছে ছিল এত সুন্দর করে বাড়িটা বানিয়েছেন বন্ধুকে দেখাবেন। ওরা দুজন দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব সুক্ষ্ম ভাবে হলেও একটা প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয় দুই বন্ধুর মধ্যে। এটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

পরশ্রীকাতর সকলেই কম বেশি থাকে। কেউ প্রকাশ করে, কেউ গোপন রেখে চলতে পারে। রামবাবু আর শ্যামবাবুর মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব আবার একই সঙ্গে একটু প্রদর্শনবাদ আছে দুজনের ভেতর। প্রদর্শনবাদ মানুষের মধ্যে বিরাজ করে অনেক সময়ে। উচ্চ চিন্তার মানুষেরা এর থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারেন।

সেদিন রামবাবু তার বন্ধুর জন্য ভালো খাওয়া দাওয়া ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তার গিন্নী নানা পদের রান্না করলেন- অনেক দিন পর নিজের নতুন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন তার বরের বন্ধুকে। শ্যামবাবু দুপুরে স্ত্রীকে নিয়ে রামবাবুর বাড়িতে এলেন। বাড়ির দরজায় রামবাবু তাদের স্বাগত জানালেন, ভিতরে নিয়ে গেলেন। সামনেই সুন্দর করে সাজানো ড্রয়িং রুমে বসালেন। রামবাবুর স্ত্রী ট্রে সাজিয়ে এনে চা জল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। চা পানের পর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাতে লাগলেন। সেগুন কাঠের ভারি দরজা, দেয়ালে দামি রং, মেঝেতে দামি পাথর আর ফ্লোর টাইলস, বাথরুমে মূল্যবান ফিটিংস, সব দেখিয়ে ছাদে নিয়ে গেলেন। সেখানেও শৌখিন বাগান করেছেন রামবাবু । সেটাও দেখালেন। একপাশে ফুল ফুটেছে-ডালিয়া চাঁপা রজনীগন্ধা বগনভিলা অন্য পাশে সবজি নানান রকমের। কি সুন্দর ছোটো ছোটো বেগুণ ধরেছে গাছে, ফুলকপি ওলকপি পালং শাক বাঁধা কপি এসব।

সব ঘুরিয়ে দেখানোর পর নিয়ে এসে বসলেন ডাইনিং হলে সোজা খাওয়ার টেবিলে। টেবিলটাও সাজানো নানান খাবারে। রামবাবুর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিবেশন শুরু হল। বেগুনভাজা, মুড়িঘন্ট, পাবদা মাছের কালিয়া, খাসির মাংস, চিংড়ীর মালাইকারীচাটনি দৈ মিষ্টি রাজভোগ। খাওয়ার মাঝ পথে যখন রামবাবুর স্ত্রী পাবদা মাছটা তুলে দিয়েছেন শ্যামবাবুর পাতে তখন রামবাবু বললেন, 'দাদা বলুন রান্না কেমন হয়েছে? আমার গিন্নীর হাতের রান্না। আপনাদের জন্য স্পেশাল করে রেঁধেছেন।' শ্যামবাবু বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ ভালো হয়েছে কিন্তু পাবদা মাছটা অনেক বড়ো তো তাই স্বাদ একটু কম, সাইজ একটু ছোটো হলে স্বাদ আরও ভালো হত।'

রামবাবু আর তার স্ত্রী মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। কিছুক্ষণ সকলে একটু

নীরব। শ্যামবাবুর স্ত্রী নীরবতা ভাঙলেন, 'বৌদি, মাটন রেজালা কিন্তু খুব ভালো লাগছে। দারুণ করেছেন এটা।' শ্যামবাবু আবার বলে উঠলেন, 'একটু বেশি মিষ্টি দিয়ে ফেলেছেন মাটন রেজালায়। না হলে আর সব ঠিক ছিল।' রাম বাবুর স্ত্রীর মুখটা অন্ধকার হয়ে উঠল। সকল হাসি আর উদ্দীপনা মিলিয়ে গেল।

খাওয়া শেষে বিদায়ের আগে রামবাবু বললেন, 'দাদা বললেন না, বাড়িটা কেমন বানিয়েছি?' শ্যামবাবু টুথ পিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, 'বাড়িটা বানিয়েছেন ভালো, কিন্তু আপনার রঙের চয়েসটা ঠিক হয়নি একেবারেই। ঘরের দেয়ালের রং ক্যাটকেটে লাগছে। বাথরুমের টাইলস আর একটু ভালো দিতে পারতেন, এতই খরচা করেছেন যখন। তা ছাড়া এত বড়ো বাথরুমে শুধু জায়গা নষ্ট।' এবার রামবাবুর মুখটি সত্যিই অন্ধকার হয়ে গেল। শুকনো নমস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন বন্ধু শ্যামবাবুকে।

- কি হতে পারত আর কি হল? এটাই হচ্ছে বিতৃষ্ণার কারসাজি। শ্যামবাবু যে সচেতন ভাবে রামবাবুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলেছেন বা অপমান করার জন্য বলেছেন তা কিন্তু নয়। এই বিতৃষ্ণা তার উপর চেপে বসা আবেগ। সে নিজে অনেক সময় জানেই না যে তার কথায় মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। বরং একটু গর্ববোধ করেন নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে। অন্যদিকে কেউ তাকে শুধরে দিতে গেলে চারটি কথা শুনিয়ে দেবেন তাকে। বলবেন, 'যেটা ঠিক সেটাই তো বলেছি। ভুল বলেছি কিছু?' এবার তিনিই যে সব সঠিক বলছেন সেটা নিয়ে একপ্রস্থ কথা শোনাবেন। এ সকল মানুষের ধারনা যে তিনিই একমাত্র সঠিক বলেন ও বোঝেন।

পৃথিবীতে এমন কত শত মানুষ প্রতিনিয়ত এমন কত মানুষকে ছোটো ছোটো আঘাত দিয়ে চলেছে তার খবর আমরা জানিনা। সকল সময়েই যে নিজের জ্ঞান সবার সেরা হতে পারে না- এটা তার ধারনায় আসেই না। সকল সময়েই যে অন্যের সমালোচনা করে কষ্ট না দিয়েও পৃথিবীর আহ্নিক গতি ঠিক রাখা যায় সেটা এ ধরনের মানুষ ভাবেও না, বোঝেও না।

বিরাগ বা বিতৃষ্ণা শরীরে ও মনে কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পায়, যেমন-

- বিরাগ বা বিতৃষ্ণার বস্তুটির থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকা পছন্দ।
- যে বস্তু বা বিষয়ের উপর বিরাগ সেটি দৃষ্টিগোচর হলেই বিরক্তি বোধ করা।
- এমনকি বিরাগের বস্তু বা বিষয়ের দিকে তাকালে বা তার বিষয়ে ভাবলে বমি বমি ভাব হতে পারে।
- মুখের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ভুরু কোঁচকানো বা উপরের ঠোঁট বাঁকানো।
- সব কিছুকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

- সকল খাদ্যই বিস্বাদ লাগা।
- খিদে কমে যাওয়া।
- সব রঙই অপছন্দ।
- সকলকেই অসুন্দর মনে হওয়া।
- কোন কথাই পছন্দ হয় না- ছোটো বড়ো সকলকেই অপমানকর মন্তব্য করা।
- খিটমিটে স্বভাব।
- কোন দোকানে কিছু কিনতে গিয়ে কিছুই পছন্দ করতে পারে না। সবই খারাপ তাই দোকানিকেও যা ইচ্ছা তাই শুনিয়ে দেওয়া।

বিরাগ শরীর বা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে না। বিরাগ মানুষের আবেগ সঞ্জাত একটি বিশেষ মানসিক বিক্রিয়া।

সুস্থ বা অসুস্থ, এর উপর বিতৃষ্ণা বা বিরাগ নির্ভরশীল নয়। এটি একটি সাধারণ ধর্তব্য। আবার এটা দেখা গেছে কিছু মানুষের ভগ্নস্বাস্থ্য থাকলে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা বহুগুণে বেড়ে যায়।

রক্ত দেখলে, পচাগলা কিছু দেখলে, নোংরা কিছু দেখলে, দুর্গন্ধ কিছু নাকে গেলে অথবা কেউ দুর্ব্যবহার করলে বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে যায় এদের। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি এইসকল মানুষেরা সাধারণত কখনও অনৈতিক কাজ করে না। অনৈতিক কাজ কেউ করলে তার চাটুকারিতা করতে পারেনা এরা। তার প্রতি শতগুন বিরাগ বাড়ে। খুব নিকটজন এই বিষয়টি ধরতে পারে বা বুঝতে পারে। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে তার সঙ্গে কথা বলে এবং মিশে এই অবস্থা থেকে বের করে আনা যায়। না হলে ব্যাপারটা বেশ কঠিন। আর সে ব্যক্তি যদি নিজ থেকে অনুধাবন করতে পারে তবে নিজেই নিজের মুক্তির পথ আবিস্কার করতে পারবে। মনে রাখতে হবে এটি কোনও মানসিক রোগ নয়, এটি একটি আবেগ। মানুষ সবসময়ই কোন না কোন আবেগ নির্ভর হয়েই বেঁচে থাকে। আবেগ বিহীন মানুষ তো উন্মাদ। হাসি কান্না দুঃখ থাকবেই। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো আবেগ কিন্তু কোন মানসিক রোগ নয়।

আমি এমন একজনের কথা বলব যার কথা শুনলে পাঠকও বলবেন, হ্যাঁ আমারও তো পরিচিত এমন একজন আছেন - ঠিক একই স্বভাবের মানুষ।

চৌধুরী পাড়ার নিরঞ্জনদা। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তিনিও এই বিরাগ বা বিতৃষ্ণা নামক আবেগটি বয়ে নিয়ে চলেছেন। সব কিছুতেই তার অপছন্দ। সব কিছুতেই তার খুঁত ধরা চাইই। আর এ কারণেই অনেক মানুষের তাকে অপছন্দ। প্রথম দিকে নিরঞ্জনদার সঙ্গে যেই কথা বলবে, তাকে তার ভালো লাগবে। তারপর দু'চার দিন যেতেই তার স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে আর আসে পাশের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলা শুরু করে।

এটা তো ঠিক খুব কম মানুষই সমালোচনা পছন্দ করে। আমাদের বাড়িতে তাকে বিভিন্ন সময়ে নেমন্তন্ন করি তার পরিবার সমেত। খাওয়ার টেবিলে বসে হয়ত আমি বললাম, ‘নিরঞ্জনদা, আজ আপনাদের জন্য মটন বিরিয়ানি রান্না করেছি।’ সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনদা বলে উঠলেন, ‘এই সময়ে মটন বিরিয়ানি কেউ খায়? শুধু ডাল ভাত হলেই ভাল হত। তা ছাড়া মটন খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। কোলেস্টেরল বাড়ে। এটা আমাদের খাওয়া উচিত নয়।’ একগাদা বক্তৃতা করে খাওয়াই পণ্ড করে দেয়।

আর একদিন তাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি। অর্ডার দিলাম-মাছ ভাত আর একটা শব্জি। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনদা বলে উঠল, ‘এটা কোন মেনু হল? ডাল ভাত তো রোজ বাড়িতে খাই। একটা ভাল দেখে মটন বিরিয়ানি অর্ডার করতে পারতে। তোমাদের কোন পছন্দ নেই।’ এ কথা বলে নিরঞ্জনদা নিজেই মটন বিরিয়ানি অর্ডার দিলেন-এটাই হচ্ছে বিতৃষ্ণা। সব কিছুতেই বিতৃষ্ণা।

নিরঞ্জনদাকে তাজমহল দেখালেও বিতৃষ্ণ হবে। নিশ্চয়ই বলবে, ‘এদিকটা ঠিক হয়নি। আর একটু উঁচু হলে ভালো হত’ অথবা ‘এই তাজমহল দেখার কি আছে? এ আর এমন কি? শুধু সময় নষ্ট করা আর একগাদা টাকা আর সময় নষ্ট হল। তোমরা শুধু শুধু আমাকে এতদূর টেনে আনলে।’ আবার এটাও ঠিক তিনি কিন্তু তাজমহল দেখতে আসার সময় তেমন খুব জোরাল প্রতিবাদ করেননি। বিতৃষ্ণা সঙ্গে নিয়েই এসেছেন এবং এসেও বিতৃষ্ণা ছড়াচ্ছেন।

আর একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যেটি মজারও। যে পরিবারের অভিবাবক নিরঞ্জনদা সেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও তার এই বিতৃষ্ণা আবেগটি সংক্রমিত করতে পেরেছেন। তারাও ওই একই ধরণে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে শিখে যায়। তার ছেলে বউ সকলেই বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। পাঠকও তার আশেপাশে খোঁজ করলে এমন মানুষ ও এমন পরিবার পেয়ে যাবেন যে বিতৃষ্ণা নিয়েই চলেছেন বংশ পরম্পরায়।

পণ্ডিতেরা এর ব্যাখ্যা করেছেন যে এটা জিনগত আবেগ। এর পেছনেও রয়েছে জিন। কোনটিই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিতৃষ্ণাকে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার বিষয় নয় একেবারেই। কি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে শুনলে পাঠক অবাক হবেন। চন্দ্রনাথবাবু এমন একজন বিতৃষ্ণা আশ্রয়ী মানুষ। পরিবারেও সংক্রমিত আছে বিতৃষ্ণা।

চন্দ্রনাথবাবুর ছেলে ইন্দ্রনাথ বেশ ভালো ছেলে। চন্দ্রনাথবাবু অনেক দেখাশোনা করেই তার ছেলে ইন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন। মেয়ে বেশ ভালো, নাম তার তরুলতা। তরুলতা অবশ্যই ইন্দ্রনাথের যোগ্য বলা উচিত- শিক্ষা দীক্ষা পরিবার চেহারা উচ্চতা গায়ের রং। কিন্তু বিয়ের দু'চারদিন পর থেকেই চন্দ্রনাথবাবুর

ঘাড়ে চেপে থাকা বিতৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ছেলের বউয়ের কোন কিছুই তার ভালো লাগে না। চলন বলন রান্না পোশাক পরিচ্ছদ সবই।

বাড়িতে কেউ বেড়াতে আসলে তরুলতার সামনেই তার অপছন্দের কথা বলবেন, বিতৃষ্ণার কথা বলবেন। তরুলতার সামনেই তাদের বলেন, 'আর একটু খোঁজ করলে আরও ভালো মেয়ে পাওয়া যেত ইন্দ্রনাথের জন্য। আরও ফর্সা, আরও শিক্ষিত মেয়ে পেতামই'- ইত্যাদি। প্রথম প্রথম তরুলতা কিছু বলত না। কিছুদিন পর মুখ খুলতে শিখল তরুলতা। মুখের উপর প্রতিবাদ করত তরুলতা। মুখের উপর তরুলতা তর্ক করলে চন্দ্রনাথবাবু খুব দুঃখ পেতেন। এভাবেই ঘনীভুত হতে থাকল বাড়ির পরিবেশ। ইন্দ্রনাথ দু'একবার তরুলতাকে বোঝাতে চেষ্টা করে,'বাবা একটু এমনই। মনের থেকে তোমাকে খারাপভাবে না। একটু মানিয়ে নাও, তরুলতা।' তরুলতাও বোঝার চেষ্টা করত, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা যে করেনি তাও নয়। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু থামতে পারেননি।

ইন্দ্রনাথ ওর বউকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেছে। রাতে বাইরে রেস্টুরেন্টে খেয়ে একটু রাতে বাড়ি ফিরেছে। চন্দ্রনাথবাবু তার স্বভাবসিদ্ধ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেন সেই রাতেই। চন্দ্রনাথবাবু ভুলে গেলেন তার যৌবনকালের আচরণের কথা।

ছেলের বউকে বলেন এটা অপছন্দ, ওটা অপছন্দ। ছেলেকে বলেন, 'বিয়ের পর তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তোমার নিজের ব্যক্তিত্বটাও হারিয়ে ফেলছ। এমন তো ছিলে না। এটা আমার ভালো লাগে না।' বউমার বাবা মাকেও বলা শুরু করলেন, 'আপনাদের মেয়ের নানান দোষ। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখাননি আপনারা।'

সুখের বাড়িতে বিতৃষ্ণার চোরা স্রোত বইতে শুরু করল। স্রোত ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্লাবনের আকার নিল। মেয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে আর আসতে চাইছে না। 'শ্বশুরমশাই খারাপ মানুষ। ও বাড়িতে আমি যাব না।' সকলেই বলে, 'এত ভালো পরিবার। কোনকিছুর অভাব নেই। ইন্দ্রনাথ কত ভাল ছেলে।'

অশান্তি আর ভালো লাগে না ইন্দ্রনাথের। অবশেষে ইন্দ্রনাথ কলকাতায় ফ্লাট কিনে চলে গেল। অনেকেই বউয়ের দোষ খুঁজে বের করল, 'তরুলতা ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আলাদা ফ্লাটে চলে গেল শ্বশুর শাশুড়িকে ফেলে। কি যে দিনকাল পড়েছে।'

এমন ঘটনা আকছার ঘটছে। অথচ একটু সতর্ক থাকলেই পৃথিবী সুন্দর হতে পারত।

Disgust is an emotional response of rejection or revulsion to something potentially contagious or something considered offensive, distasteful, or unpleasant. In The Expression of the Emotions in

Man and Animals, Charles Darwin wrote that disgust is a sensation that refers to something revolting.Disgust is a feeling of revulsion or strong disapproval aroused by something unpleasant or offensive.

Disgust is another of the original six basic emotions described by Eckman. Disgust can be displayed in a number of ways including:

- Turning away from the object of disgust
- Physical reactions such as vomiting or retching
- Facial expressions such as wrinkling the nose and curling the upper lip

This sense of revulsion can originate from a number of things, including an unpleasant taste, sight, or smell. Researchers believe that this emotion evolved as a reaction to foods that might be harmful or fatal. When people smell or taste foods that have gone bad, for example, disgust is a typical reaction.

Poor hygiene, infection, blood, rot, and death can also trigger a disgust response. This may be the body's way of avoiding things that may carry transmittable diseases. People can also experience moral disgust when they observe others engaging in behaviours that they find distasteful, immoral, or evil.

বিস্ময়
(Surprise)

একম্যান যে ছয়টি মুল আবেগের বর্ণনা দিয়েছেন সেই মুল ছয়টি আবেগের মধ্যে বিস্ময় অন্যতম। কোন আকস্মিক ঘটনা যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল তেমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হলেই সৃষ্টি হতে পারে বিস্ময়ের।

ধীরে সুস্থে কোন ঘটনা ঘটলে বিস্ময়ের সম্ভাবনা কমে যায়, অথবা বিস্ময়ের ব্যাপকতা কমে যায়। বিস্ময় সকল আবেগের মধ্যে সবচেয়ে কম সময় মনে অবস্থান নেয়। বিস্ময়ের স্থায়িত্ব অন্য সকল আবেগের চেয়ে কম। স্বল্পস্থায়ী এ বিস্ময় কাটতেই উপস্থিত হয় প্রতিক্রিয়া। বিস্ময়ের প্রতিক্রিয়া- যে কোন কর্মে এবং পদ্ধতিতে।

তন্ময় ও সজীব দুই বন্ধু, খুবই ঘনিষ্ঠ ওরা, গলায় গলায় ভাব। উচ্চমাধ্যমিকে পড়ে ওরা দুজনেই সেন্ট জেভিয়ার্স এর ছাত্র। তন্ময় জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়েছিল। সজীব জয়েন্টের জন্য ফরম তোলেনি। সজীব বলেছিল, 'আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না।' তন্ময়ও বলেছিল, 'আমিও পারব না। আমার দ্বারাও হবে না। তবু পরীক্ষা আমি দেব। দেখা যাক কি হয়।' কিছুদিন পর জয়েন্টের রেজাল্ট বেরল। সজীব অবাক বিস্ময়ে দেখল তার বন্ধু তন্ময় এন আর এস মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছে। সজীব বিস্মিতই হয়েছিল। সেও ভেবেছিল তন্ময় চান্স পাবে না। ওর বন্ধু মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়াতে সজীবও মহা খুশি। কিন্তু বিস্ময় তাকে সাময়িক উত্তেজিত করে। তার বিস্ময় কাটতেই তার মধ্যে শুরু হল প্রতিক্রিয়া। প্রস্তুতি শুরু করল সজীব ভবিষ্যতের পরিকল্পনার।

যে সজীব জানত তার দ্বারা কিছু হবে না সেই সজীব এখন এক মালটিন্যাশনাল কোম্পানির সি ই ও। এর আগে সে মাস্টার্স করেছে, এম বি এ করেছে একের পর এক হার্ডলস পার করেছে। আর উঠে এসেছে উপরে। সজীবের কাছে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার কথা। সে বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু, একটা বিস্ময় আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তন্ময়ের সাফল্যের বিস্ময় সেদিন আমার ভিতরে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছিল।' আমি সজীবকে বলেছিলাম, 'তন্ময়ের সাফল্য তোমার মধ্যে হিংসা তৈরি করেনি?' সজীব বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু, তন্ময় আমার

প্রিয় বন্ধু। তন্ময়ের সাফল্যে আমার মধ্যে হিংসা তৈরি করেনি। হিংসা তৈরি হলে হয়ত আমি উপরে উঠতে পারতাম না। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আর এই বিস্ময় আমাকে উজ্জীবিত করেছিল।'

এখানেই বিস্ময়ের বিশেষত্ব। এটা আপনা আপনি মনে উদয় হয়। আবেগ একটা স্বতস্ফূর্ত উৎপাদন। এটা নিজে থেকে তৈরি করা যায় না। কোন ঘটনা কার মনে বিস্ময়, হিংসা, ক্রোধ বা দুঃখ তৈরি করবে সেটা একেবারেই ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। শুধু ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না, সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

বিস্ময় হতে পারে ধনাত্মক, ঋনাত্মক কখনো বা নিস্তরঙ্গ। বিস্ময় হতে পারে অপ্রিয়। বিস্ময় হতে পারে আনন্দের। যেমন রাতের বেলা একলা পথে আপনি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটি বিকল হয়ে গাড়ি থেমে গেল। স্টার্ট নিচ্ছে না। তখন একটা মানুষ একটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ আপনার গাড়ির সামনে এসে পড়ল। এতে আপনার আচমকা এক ভীতিপ্রদ বিস্ময়ের সৃষ্টি হতে পারে আপনার মনে। এর একটু পর সেই ব্যক্তি আপনাকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিল যাকে আপনি চেনেনই না, তার সাহায্যে গাড়ি স্টার্ট নিল। তখন শুরু হবে অন্য এক বিস্ময়ের। সেটি আনন্দের বিস্ময়। এ ভাবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়ের ধরণে পরিবর্তন আসে, বিস্ময় এভাবে রূপ বদলায় সময়ের সাথে, অবস্থানের সাথে।

আবার আপনি হঠাৎ দেখলেন একদিন আপনার পরিচিত জনেরা আপনার বাড়িতে এসে হাজির হল আপনার শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আর তারা চাইল আপনার জন্মদিন পালন করতে। তারা কেক কাটল আর সকলে মিলে আপনার সাথে আনন্দ করল, অথচ আপনি ভুলেই গেছিলেন যে আজ আপনার জন্মদিন। এই আকস্মিক ঘটনায় আপনার মধ্যে সৃষ্টি হবে বিস্ময়ের, আপনার শরীরে একটা শিহরণ ও পুলক অনুভব আসবে এ বিস্ময়ের মাধ্যমে।

এমনও আছে যে চরম বিস্ময়কর ঘটনা অথচ সেটা আপনার নিকট আকস্মিক কিন্তু মনে বা শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। সেই একই ঘটনা অন্য একটি ব্যক্তির মনে গভীর ব্যথা অথবা আনন্দের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন আপনি টেলিভিশনে একদিন হঠাৎ শুনছেন, সুদূর সুইজারল্যান্ডের কোন এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আতঙ্কবাদী হামলায় দশজন মানুষ মারা গেছে। এই সংবাদে আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দুঃখে ভেঙে পড়তে পারেন। একই সংবাদে অন্য এক ব্যক্তির বিস্ময় এমন হতে পারেন যে অন্য ধর্মের মানুষ মরেছে, আমার ধর্মের কেউ মরেনি। আবার এমনও কেউ আছে যে তার মধ্যে এই ঘটনায় কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে না এবং কোন প্রতিক্রিয়াও হবে না।

অথবা আমেরিকান পুলিশ ডেরেক চৌভিনের অমানবিক অত্যাচারে আমেরিকার মিনেপোলিশ শহরে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে যে ভাবে প্রাণ হারাতে হয় তার সংবাদে বিস্মিত হয়েছিল আমেরিকাবাসী। বিস্ময় কাটতে সময় লাগেনি মানুষের। তারপরই শুরু হল বিক্ষোভ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউ ইয়র্ক, ম্যান হাটন সর্বত্র। এভাবে এক আকস্মিক বিস্ময় থেকে দাবানলের মত প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র আমেরিকায়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আমেরিকার হোয়াইট হাউসের বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

বিস্ময়ের কিছু লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া আছে যেমন-

- মুখমণ্ডলে- চোখের ভুরূ উপরে তুলছে, যাকে বলে চোখ কপালে তোলা।
- চোখ প্রসারিত হওয়া।
- হঠাৎ লাফ দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া।
- মুখে বিস্ময়ের চিহ্নবোধক নানা শব্দ করা, কেঁদে ফেলা, হঠাৎ কিছু বা কাউকে আঁকড়ে ধরা।
- বিস্ময়ে ফুটতে শুরু করে দিতে পারে।
- টাকা পয়সা বিলিয়ে দিতে পারে।
- আনন্দে মুঠো মুঠো টাকা আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে।
- জোরে জোরে ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করতে পারে।
- দুঃখজনক সংবাদে বিস্মিত হয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

বিস্ময়ের নানান প্রভাব পড়ে শরীরে ও মনে ও আচরণে। এটি ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে এমন ভাবে প্রভাবিত করতে থাকে যা সহজে নজরে নাও পড়তে পারে। কিছু বিস্ময়কর সংবাদ বা কিছু পূর্বে ঘটে যাওয়া বিস্ময় তাকে এমন ভাবে নাড়া দিতে থাকে যে, সে সকল সময়েই বিস্ময়কর বিষয়ের সন্ধানেই থাকে। অথবা যা কিছু দেখে বা শোনে সে সকল কিছুই তার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় বা সে ভাবেই সে ব্যাখ্যা করে। এমনও হয় যে অতি স্বাভাবিক কিছুও তার কাছে বিস্ময়কর মনে হতে শুরু করে। সে ব্যক্তি অনেক সময় সব কিছুতেই বিস্ময়কর দেখেন এবং মনে করেন এগুলোতে ঈশ্বরের হাত আছে। যে কোন ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসলেই তাকে বলবেন, 'আমি অবাক ও বিস্মিত যে আজই আপনি আমার কাছে এসেছেন। ঈশ্বর না পাঠালে আপনার সাথে আমার দেখা হতেই পারে না।'

অনেক সময়ে বিস্ময়ের আকস্মিকতায় মানুষ হতবুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে কোন দুঃখের সংবাদে তারা ভেঙে পড়ে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বন্ধ করে দেয়, আচরণে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা

যায়। ঘুম আসে না, ক্ষুধা থাকে না, কাজে মন বসে না- এরা না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। না খেয়ে দিনের পর দিন কাটায়। এসব করতে গিয়ে তার চাকরি চলে যায়, শরীর ভেঙে যায়- এমন ঘটনাও ঘটে।

একটি ঘটনার কথা বলব। পাঠক বুঝবেন ঘটনার আকস্মিকতা কি ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বিধান শ্যামবাজারে নিজের বাড়ীতেই থাকেবাবা মায়ের সঙ্গেই। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান বিধান। এম বি এ পাশ করে টাটা কনসালটেন্সিতে চাকরি করছে এক বছর হল। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর চাকরি সুত্রে সুনিতার সঙ্গে পরিচয়।

সুনিতা অন্য এক কনসালটেন্সি ফার্মে চাকরি করে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। উইকএন্ডে এখানে ওখানে ঘুরতে যায় দুজনে। রেস্টুরেন্টে খেতে যায়, সিনেমা হলে পাশে বসিয়ে সিনেমা দেখে, ওদের সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে থাকে ক্রমেই।

সুনিতা একদিন কলকাতা পিটারক্যাট রেস্টুরেন্টে থাই স্যুপ খেতে খেতে বিধানকে বলল, ‘জানো, তোমার কথা আমি মাকে বলেছি।’

এ কথা শুনে বিধান চমকে উঠল, ‘আমার কথা মাসিমাকে বলেছ? তোমাকে নিশ্চয় খুব বকেছেন।’

— ‘দূর বোকা, বকবে কেন? আমি বলেছি আমরা ভালো বন্ধু।’

— ‘তা তোমার মা কি বললেন?’

— ‘কি বললেন , জানো? শুনে তুমি খুশিই হবে।’

— ‘কি বললেন, বল শীঘ্রি।’

— ‘মা বলেছেন, বন্ধু যখন, তাহলে তোর বন্ধুকে আমাদের বাড়িতে একদিন তো নিয়ে আসতে পারিস। যাবে তো আমাদের বাড়িতে? মা আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, বুঝলে?’

— ‘আমি তোমাদের বাড়ি যাব? সে কি করে হয়? তাই হয় নাকি?’

— ‘কেন হয় না? তুমি যেতেই পার।’

অনেক পীড়াপিড়ি করে একদিন বিধানকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল সুনিতা। বাড়িতে যাওয়ার সময় ওদের রাস্তার মোড়ের বিষ্টু ঘোষের মিষ্টির দোকান থেকে তিন চার রকম মিষ্টিও কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকল সুনিতা। সুনিতা ওর মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, ‘মা এই সেই বিধান, আমার বন্ধু। তোমাকে বলেছিলাম না?’

বাবা বাড়ি আসলে তার সাথেও পরিচয় হল। অনেকক্ষণ কথা বার্তা গল্প হল। গল্পের ফাঁকে চা হল, মিষ্টি হল। এক কথায় সন্ধ্যাবেলাটা ভালো কাটল। চলে আসার আগে সুনিতা বিধানকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। বলল, ‘চল আমার ঘর দেখিয়ে আনি। সুন্দর পরিপাটি সাজানো ঘর। সুনিতা বলল, ‘কি বলেছিলাম? আমার মা খুব ভালো না?’

—'হ্যাঁ, সত্যিই মাসিমা খুব ভালো।'

বেরনোর সময় বিধান সুনিতার সঙ্গে খুনসুটিও করল। বিধান ভদ্র ছেলে। সীমারেখা অতিক্রম করতে জানে না।

ঘরের বাইরে এসে বলল, 'এবার আসছি, মাসিমা। ফিরতে হবে, দেরি হলে ওদিকে আমার মা চিন্তা করবে।'

—'হ্যাঁ, এসো বাবা, আবার এসো। সাবধানে যেও।'

একদিন শনিবার অফিস ছুটি হলে অফিস থেকে ফেরার সময় সুনিতার অফিসে গেল বিধান। শনিবার হলে বিধান ছুটির পর এরকমই সুনিতার অফিসে যেয়ে হাজির হয়। তারপর দুজন কোথাও কিছুক্ষণ ঘুরে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফেরে ওরা। আজ নিজ থেকেই সুনিতা বিধানকে বলল, 'চল আজ ইকো পার্কে যাই। জায়গাটা বেশ রোমান্টিক।'

বিধান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাই হবে মহারানী। চল।'

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিউটাউনের ইকো পার্কের দিকে রওনা হল। ইকো পার্কে শনিবারের সেই সন্ধ্যায় একটা ছোট্ট ঝোপের পাশে লেকের ধারে নিবিড়ভাবে বসল দুজনে।

আস্তে আস্তে সুনিতা বিধানের হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'বিধান, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তুমি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বললে না? দেখাবে না, তোমার শোবার ঘর? দেখাবে না, ছাদে তোমার ফুলের গাছ—তোমার বগনভিলা?'

বিধান ওর কথায় সুনিতার হাতের মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'সুনিতা, আমিও ভেবেছি। কিন্তু আমার মা এটা হয়ত পছন্দ করবে না। আমি মাকে খুব ভালোবাসি। মায়ের অবাধ্য হতে পারব না। মাকে কোন কষ্ট দিতে পারব না আমি।'

সুনিতা ওর কথায় কষ্ট পেলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না। মুখে একটা হাসির রেখা টেনে বলল, 'কিন্তু আমরা তো অ্যাডাল্ট, আমরা বন্ধু। দুজনে চাকরি করি। আমি তোমার বাড়ি গেলে মাসিমা অসন্তুষ্ট হবেন কেন? বন্ধুর বাড়িতে তার বন্ধু যেতে পারে না? আমি যাব তোমার বাড়ি।'

—'জানো সুনিতা, মা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। সব সময় আগলে রাখে। চাকরিতে জয়েন করার দিন মা আমাকে বারবার বলেছে, বিধান, খেয়াল রাখিস বাবা, - যেন কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যাস না। কেউ আমার ছেলেকে আমার থেকে আলাদা করুক আমি সহ্য করতে পারব না।'

'তুমি যেমন আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছ তেমনি আমি মাসিমার সঙ্গেও দেখা করব, কথা বলব। তুমি বলবে মাসীমাকে যে আমরা বন্ধু। মাসিমা তোমাকে

প্রচণ্ড ভালবাসেন সেটা ঠিক, কিন্তু আমি তোমার বাড়ি গেলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন এটা ওনার বাড়াবাড়ি।'

সুনিতাকে অবাক করে এবার বিধান সুনিতার উপর একটু রেগেই গেল। মায়ের কোন সমালোচনা সহ্য করতে পারে না বিধান।

বলে ওঠে বিধান, 'এটা তুমি কি বলছ? আমার মায়ের এটা বাড়াবাড়ি? আমার মাকে তুমি চেনো না। মা আমার খুবই ভালো। শোনো সুনিতা, মা আমার জীবন, আমি আমার মায়ের কোন সমালোচনা সহ্য করি না।'

শান্ত স্বরে সুনিতা বলল, 'তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন এটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। আমি যে ভাবে বললাম তা নিয়ে তুমি এমন ভাবে রিঅ্যাক্ট করছ এটা ঠিক না। তুমি তো আর শিশুটি নও। মাকে নিয়ে এভাবে রিঅ্যাক্ট করাটা তোমার বাড়াবাড়ি।'

- 'মা তার ছেলেকে ভালোবাসে এটা বাড়াবাড়ি? তুমি জানোই না সুনিতা, মা আমাকে কতখানি ভালোবাসে। তুমি কি জানো?- আমি এখনো মায়ের সাথেই ঘুমোই? আলাদা শুতে পারি না আমি, মাকে ছাড়া।'

-'সে কি? তুমি মায়ের সাথে ঘুমোও? এটা তো আরও একটা অবাক করা কথা বললে? এত বড়ো ছেলে- তুমি কি বাচ্চা দুধের শিশু যে মায়ের সাথে ঘুমোবে?'

- 'হ্যাঁ আমি মায়ের সাথে ঘুমোই তা কি হল? আমি তো সেই ছোটো বেলা থেকেই তো মায়ের সাথে ঘুমোই। তা কি হল?'

- 'এটা দৃষ্টিকটু। তোমার বয়স আটাশ বছর। এত বড়ো একটা ছেলে মায়ের সাথে এক বিছানায় ঘুমোয়? লোকে শুনলে কি বলবে? তুমি এটা বন্ধ কর। এ জন্যেই তোমার মা তোমাকে প্রেম করতে দিতে এত ভয় পান।'

- 'তুমি কি বলতে চাইছ বলতো? তুমি থামবে? এখানে যেন ঝগড়া করতেই এনেছ আজকে। অন্য কথা বল তো বল না হলে চল বাড়ি যাই।'

বিধান কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল। সুনিতাও একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি তো একটা মেয়ে। আমিও মায়ের সাথে ঘুমোই না। বড়ো হয়েছি না? তুমি তো দেখলে যে আমার আলাদা ঘর আছে।'

- 'ঠিক আছে বাবা তুমি অনেক বড়ো হয়েছ, বুড়ি হয়ে গেছ তুমি, তোমাকে তোমার মায়ের সাথে ঘুমোতে হবে না। এসব নিয়ে আমি তোমার সাথে আর কথা বাড়াতে চাই না, সুনিতা।'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ঘাসের উপর। একটু অভিমানে একটু কষ্টে দুই আঙুলে নরম ঘাসের ডগা ছিঁড়তে লাগল সুনিতা। অনেকক্ষণ কোন কথা নেই ওদের। বিধানই নীরবতা ভেঙে বলল, 'চল। ওই দেখ ওদিকের রেস্টুরেন্টে যাই। দুজনে ঝগড়া করে বেশ খিদে পেয়েছে। কিছু খাই।'

-'চল সেই ভালো। কিছু খেলেই হবে সন্ধি।'

রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ বসে ফিস কাটলেট আর চা খেল বিধান। সুনিতা খেল আইসক্রিম। ওরা বাড়ি ফিরল সেদিনের মত।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে একটু রাতই হয়ে গেল আজ। বাড়ি ঢুকতেই মা সুনিতাকে বলল, 'এত রাত করে বাড়ি ফিরলি সুনিতা। এমন তো করিস না। কোথায়ে ছিলিস এতক্ষণ?'

-'আমি বিধানের সঙ্গে ছিলাম।এত চিন্তা করো না।'

-'কি যে বলিস সুনিতা, মা হয়ে চিন্তা করব না তা কি হয়? তা বিধান কি বলে? এত যে দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? বিয়ে টিয়ের কথা কিছু ভাবছিস?'

-'আমি বিধানকে এ সব কিছু বলিনি। আমি এসব ওকে বলতে পারব না। তোমার দরকার হলে তুমি বলো এদিন আসলে।'

-'এ মা কি বলে মেয়ে আমার? আমার কি দরকার? তোর কোন দরকার নেই বুঝি?'

পরের রবিবার বিধান আসলে সুনিতার মা চা পানের ফাঁকে বলল, 'বাবা বিধান, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। সুনিতাকে তোমার পছন্দ? আমরা ওকে তোমার হাতেই দিতে চাই।'

-'মাসিমা, আমি তো এ সব এখনো কিছুই ভাবিনি। সুনিতা কি বলে?'

-'সুনিতা কি বলবে? সে তো তোমাকে নিয়েই ভাবে নিশ্চয়।'

-'দেখুন মাসিমা, সুনিতা আমার বন্ধু। আমি তো এটা ভাবতেই পারি। কিন্তু আমি আমার মাকে কি ভাবে রাজি করাব সেটাই বড়ো ভাবনা। মা কি রাজি হবে?'

'কেন রাজি হবে না? আমার সুনিতাকে কি কোনো দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে বেমানান? ওর চেহারা, লেখাপড়া, চাকরি, আমাদের পরিবার কোনটা কম বলো?'

-না, আমি তা বলিনি, মাসিমা। সুনিতা যথেষ্টই ভালো বন্ধু আমার। কিন্তু সমস্যা- মা ভীষণ পজেসিভ। আমি কি ভাবে কথাটা বলব আর মা কি ভাবে নেবে সেটাই আমার ভাবনা। যদি রাজি না হয়? যদি কষ্ট পায়?'

-'দেখ বাবা, তোমরা দুজনে যে ভাবে মেলামেশা করছ আমাদের তো একটা চিন্তা করতেই হবে।'

-'ঠিক আছে মাসিমা, আমি মায়ের সাথে সময় করে কথাটা বলব। আর সুনিতা? আমাকে ছাড়া সে আর কোথায় যাবে?'

-'যাক বাবা, তোমার কথায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম । তোমাদের দু'টিকে এক করে দিতে পারলে আমাদের শান্তি।'

সে রাতে খাওয়ার পর শুতে যেতে যেতে বিধান মাকে বলল, 'মা আজ তোমাকে একটা কথা বলব।'

-'বল। কি কথা সোনা?'

-'তুমি রাগ করবে না, বলো আগে?'

-'তোর উপর রাগ করব কেন, বল।'

- 'মা, আমি সুনিতা নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসি । ওকে বিয়ে করতে চাই। তুমি না করো না।'

ওর মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, কোন কথা বলল না।

বিধান বলল, 'মা, তুমি রাগ করলে, মা?'

তাও ওর মায়ের মুখে কোন কথা বেরলো না। ওর মায়ের চোখে জল বিধান দেখতে পারেনি।

অনেকক্ষণ পর মা বিধানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই বড়ো হয়েছিস, বাবা। এতদিন তোকে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছি। আমি তো বেঁধে রাখতে পারব না চিরকাল । তোর যখন পছন্দ আমি আর না বলব না।'

দুই পরিবারের দেখা দেখি হল। আশীর্বাদও হল। সামনের অঘ্রানে বিয়ে।

আশীর্বাদের দিনরাতের খাওয়া শেষে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে মা বলল, 'বিধান, বিয়ে করার পর আমাকে পর করে দিস না সোনা আমার।'

বিধান তার মাকে বলে, 'মা, কেউ এসে তোমাকে আমার থেকে দূরে নিতে পারবে না। এমনকি সুনিতাও না। আমি সুনিতাকে সব বলেছি যে তুমি আমাকে কত ভালোবাসো। ওকে বলেছি যে তুমি আমার সব।'

বিধান দেখতে পারেনি মায়ের চোখে তখন জল ছলছল।

এরপর সবকিছু সহজ পথে এগোলে আমার এত কথা লেখার প্রয়োজন হত না।

গতকাল হঠাৎ অফিস থেকে বিধানকে দেরাদুন পাঠাল অফিসের কাজে। যেতেই হল। যাওয়ার সময় মাকে বলে গেল, 'সাবধানে থেকো মা।' দেরাদুন পৌঁছে পরদিন সকালেই বিধান ওর বাবার ফোন পেল, 'মায়ের বুকে ব্যথা করছে। নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়েছি।'

বিধান মায়ের অসুখের কথা শুনে আর দেরি করেনি। কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই সেদিন রওনা হল বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছে এসে দেখে অনেক মানুষের ভিড়। বুকটা কেঁপে ওঠে বিধানের। ভিতরে ঢুকতেই যেন ভয় পাচ্ছে। কাছে যেতেই বাবা ওকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'তোমার মা আর নেই। সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে।' বিধান বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে মায়ের নিথর দেহ। একটু আগে নার্সিং হোম থেকে এনেছে। যে মা তাকে এত ভালোবাসত, সেই মা তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদল বিধান।

নিয়ম মত সৎকার করা হল। পাড়ার সকলে সাহায্য করল।

এরপর বিধান আর অফিসে যাচ্ছে না। ওর মায়ের বিছানায় সারাদিন শুয়ে

থাকে। খায় না। ওর বাবা কত বোঝাল, খাওয়াতে পারছে না। বাবাকে বলেছে, ‘বাবা এ কি করে সম্ভব? মা আমাকে ফেলে চলে যেতে পারে না। আমি কি নিয়ে থাকব?’

সুনিতা ফোন করে বিধানকে পাচ্ছে না। সুনিতা ওর মায়ের খবরটা জানতে পারেনি। কেউ তাকে বলেনি। ফোন করলে বিধান ফোন কেটে দিচ্ছে। ভেবেছিল হয়ত কাজে ব্যস্ত তাই ফোন ধরছে না। সোজা ওর বাড়িতে এসে হাজির। বিধানের ঘরে ঢুকে ওর সামনে বসল। বাড়িতে ঢুকতেই সুনিতা বুঝতে পারল কি ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে এ বাড়িতে।

জিজ্ঞাসা করল সুনিতা, ‘আমাকে কিছুই জানালে না?’

বিধান সুনিতার মুখের দিকে না তাকিয়েই আচমকা বলে ওঠে, ‘তোমার জন্যেই আমার মা মারা গেছে।’

বিস্মিত সুনিতা বলে, ‘আমার জন্যে তোমার মা মারা গেলেন? এমন কথা বলতে পারলে তুমি?’

বিস্মিত হতচকিত সুনিতা।

অনেকক্ষণ বসে থেকে চোখের জল ফেলল সুনিতা। যখন দেখল বিধান কোন কথাই বলছে না, চোখ মুছতে মুছতে বলে গেল, ‘আমি আসছি। পরে আসব।’

মায়ের মৃত্যুর আকস্মিকতায় এতটাই বিস্মিত হয়েছিল যে বিধান তার বাবাকে বলেছে, ‘সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার মা মারা গেছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার মা আর নেই।’

এটাই বিস্ময়ের প্রতিফলন। তার মায়ের মৃত্যু হতেই পারে না। বিধান খাওয়া ঘুম ছেড়ে দিল। সুনিতা ফোন করলে ধরছে না। শুধু মায়ের ঘরে বসে থাকে।

কেউ আসলে তাকে বলছে, ‘আমি অবাক হচ্ছি যে ভালো সুস্থ্য মাকে রেখে গেলাম, সেই মা আমাকে ছেড়ে চলে গেল? মা আমার কত কষ্ট পেয়েছে।’ বিস্ময়ের আকস্মিকতায় বিধান বিপর্যস্ত।

সুনিতা আবার এসেছিল একদিন। বিধানকে বোঝানোর চেষ্টা করল। বিধান কোন কথাই শুনছে না সুনিতার। তাকে সহ্যই করতে পারছে না। বিস্মিত সুনিতা মানতেই পারছে না যার সঙ্গে দুদিন পর বিয়ে, মায়ের মৃত্যুর কারণে তার সাথে সম্পর্কই রাখবে না? বিয়ে ভেঙে দেবে? বিস্মিত সুনিতা মেলাতে বসল- মায়ের কেন হার্ট অ্যাটাক হল? বিধান মায়ের শোকে কেন এত বিদ্ধস্ত? আর কোন রহস্য! ওকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে!

অনেক দিন বিধানের তরফে কোন সাড়া না পেয়ে সুনিতা অনেক কান্নাকাটি করল। সে বিস্মিত যে সে কোন অপরাধ করেনি, তবু তাকেই দোষারোপ করা হল কেন? সুনিতা ওর বাবা মাকে বলল সব। তারা বললেন, ‘ঠিক আছে এক বছর পর বিয়ে হবে। এক বছরের মধ্যে তো কিছু করা যাবে না।’

সুনিতা ওর বাবাকে বলল, 'বাবা, বিধান আমার কোন কথাই শুনছে না। বিধান বলতে চাইছে যে আমার জন্যেই নাকি ওর মা হার্ট ফেল করেছে।' বিধান আর ওর মায়ের মধ্যে আচরণ বেশ বিসদৃশ লেগেছিল সুনিতার। সেটাতেও বিস্ময় প্রকাশ করেছিল বিধানের কাছে, তার আরও বিস্ময় সেটা বলাতে বিধান কেন এতটা রুষ্ট হয়েছিল।

এদিকে বিধানের চাকরি চলে গেল। ওর বাবা শয্যাশায়ী হল। এক দূর সম্পর্কের পিসিমা এসে ওর বাবার দেখাশোনা করতে লাগল। তারপর একদিন সকালে বিধানের পিসিমা দেখল বিধানের ঘরের দরজা খোলা, বিধান নেই। সারাদিন অপেক্ষা করল বিধান বাড়ি ফিরল না। পাড়ার কিছু ভালোমানুষ থানায় একটা ডায়েরি করে আসল।

বিধান আর ফেরেনি। আমি গোয়েন্দাগিরিতে বসিনি বা এরপর কি হল বা কেন হল তা খুঁজে বের করব , তা নয়। ঘটনার আকস্মিকতা এমন অঘটন ঘটাতে পারে- সেটা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

Suprise is another one of the six basic types of human emotions originally described by Eckman. Surprise is usually quite brief and is characterized by a physiological startle response following something unexpected.

This type of emotion can be positive, negative, or neutral. An unpleasant surprise, for example, might involve someone jumping out from behind a tree and scaring you as you walk to your car at night. An example of a pleasant surprise would be arriving home to find that your closest friends have gathered to celebrate your birthday.

Surprise is often characterized by:

- Facial expressions such as raising the brows, widening the eyes, and opening the mouth
- Physical responses such as jumping back
- Verbal reactions such as yelling, screaming, or gasping

Surprise is another type of emotion that can trigger the fight or flight response. When startled, people may experience a burst of adrenaline that helps prepare the body to either fight or flee.

Surprise can have important effects on human behaviour. For example, research has shown that people tend to disproportionately notice surprising events. This is why surprising and unusual events in the news tend to stand out in memory more than others. Research has also found that people tend to be more swayed by surprising arguments and learn more from surprising information.

অহংকার
(Egoism)

অহংকার আমিত্ব থেকে জন্ম নেওয়া এক মানসিক বিচ্যুতি। মানুষের অবচেতন মনে জন্ম নেয় অহংকার। নিজেকে বড়ো ভাবা অথবা অন্যের কাছে নিজেকে বড়ো রূপে তুলে ধরার যে প্রবণতা সেটাই অহংকার। অহংকারের সংজ্ঞা এখানেই সীমাবদ্ধ হলনা, নিজেকে বড়ো ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের সকলকে নিজের সঙ্গে তুলনা করা এবং তাদের ছোটো করার একটা প্রতিনিয়ত চেষ্টা থাকে। অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার মধ্যে একটা বিকৃত আনন্দ পাওয়া যায় - সেটাই অহংকার।

অহংকারী মানুষ নিজের চলন বলন, কথা বার্তা, পোশাক, শিক্ষাগত যোগ্যতা সব কিছুকেই অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করার একটা প্রবণতা থাকে। পক্ষান্তরে অন্যের যা কিছু সবই খারাপ, সবই নিকৃষ্ট এমন ভাবনা সব সময় আচ্ছন্ন রাখে এদের।

অহংকারী ব্যক্তি সর্বদাই নিজ স্বার্থের কথাই ভেবে চলে, তবে এই স্বার্থপর অহংকারী ব্যক্তি খুব কমই নির্বোধ হয়। এরা খানিকটা একপেশে একগুঁয়ে তবে বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। এরা অন্যের কৃতিত্বকে কখনই মূল্য দেয় না। এরা অন্যের অর্জনকে কখনই মর্যাদা দেয় না। শুধু ব্যস্ত থাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে, লক্ষ্য রাখে নিজের স্বার্থের দিকে। এরা সমাজের পক্ষে বরাবরই ক্ষতিকর।

জেমস রাসেলের মতে, 'অহংকারী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নিজের স্বার্থের বিষয়ে মনোযোগী থাকে এবং নিজেকে কখনই মূর্খের তালিকায় থাকা বরদাস্ত করতে পারে না। এরা কখনই অন্যের সমস্যা শুনতেই চায় না।'

এরা সংসারকেও একটা গবেষণাগার বানিয়ে ফেলে। এরা নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন যে অন্যের অস্তিত্বকেই প্রায় অস্বীকার করে বসে। অন্যদের অস্বীকার করতে গিয়ে নিজেকেই দ্বিখণ্ডিত করে তোলে। এরা ভাবতেই পারে না যে নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতায় আশেপাশের সকলকেই প্রয়োজন। সংকট তৈরি করে নিজের উপস্থিতির, নিজের মধ্যে, পরিবারে ও সমাজে। সেই শূন্যতা পূরণ করতে অবলম্বন, অহংকার। এরা বুঝতেই চায় না একক 'আমি' এক অস্তিত্বহীন দ্বীপের অধিবাসী। আমরা শব্দের মধ্যেই আমাকে বেশি খুঁজে পাব- এটা ভাবতেই

পারে না এরা। বিরোধবিহীন আমি একমাত্র সমাধান , এ কথার ধার এরা ধারে না।

অহংকারী ব্যক্তির সংসারে অন্য সদস্যরা দিনের চব্বিশ ঘণ্টা এক চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে বসবাস করে। যতক্ষণ ব্যক্তিটি বাড়িতে থাকে সকলেই একটা দমবন্ধ অবস্থায় থাকে। অহংকারী লোকটি বাড়ির বাইরে গেলেই বাড়িতে যেন স্বাধীনতার খোলা হাওয়া বয়ে যায়। একই সাথে সকলের দুশ্চিন্তা,'কখন লোকটি বাড়ি ঢুকছে।'

অহংকার সবসময়েই ব্যক্তিটির চারিদিকে এক জটিল ব্যূহ তৈরি করে রাখে। সে যেখানেই যায় তার ওই জটিল ব্যূহ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। তার থেকে তার পরিবার ও প্রিয়জন বাদ যায় না। সে যেখানেই যায় তার ওই জটিল ব্যূহের মধ্যে সকলকে ঢুকিয়ে নেবে ও এক অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে।

যে কোন মানুষের মধ্যে খুব বড়ো কিছু পেয়ে গেলেই যে তার মধ্যে অহংকার শুরু হয়ে যাবে তা ঠিক নয়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুবই ছোট্ট কোন গরিমা বা প্রশংসা বাক্য থেকে অহংবোধ অঙ্কুরিত হতে পারে। অহংকারী হতে গেলে ধনী, উচ্চশিক্ষিত বা সুন্দরী হতে হবে তা নয়। এটা একটা বিকার। আমি দেখেছি অনেক গরিব পরিবারের অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অহংকারী মানসিকতা জন্ম নিতে পারে।

আবার অনেক কিছু পেয়েও অনেক মানুষ থাকেন ধীর স্থির। তারা অবশ্যই বড়ো মাপের মানুষ। অহংকার তাদের স্পর্শ করতে পারে না তাদের উদার মানসিকতার কারণে। বিরাট কোন প্রশংসা, বড়ো কোন ধন সম্পত্তির প্রাপ্তি তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না।

অহংকার একটা মানসিক অস্থিরতা। অহংকারী মানুষের ধারণা,'সেই একমাত্র জ্ঞানী অথবা সেই একমাত্র ধনী, সেই সব বোঝে। তার যা আছে অন্যের তা নেই। তার ধারণা মানুষ তাকে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে ভাবে, এক সময় সকলে ঠিক বুঝবে।' এরা সকল সময়েই অস্থির চিত্তে থাকেন—মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা দুটোই।

বেশির ভাগ সময়েই অহংকার ক্যান্সারের মত। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর গ্রাস করতে থাকে- প্রথমে নিজেকে ও পরে আশেপাশের সকলকে। ক্যান্সার যেমন মানুষকে নিয়ে যায় অবশ্যম্ভাবি মৃত্যুর দিকে তেমনি অহংকারও একজন মানুষকে নিয়ে যায় অবশ্যম্ভাবি অধঃপাতের দিকে। ক্যান্সারে রোগীর নিজের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু অহংকার শুধু ওই মানুষটির ক্ষতি করে না, অন্যেরও ক্ষতি করে। একের অহংকার ক্ষতি করে আশেপাশের সকলের। সর্বদা অহংকারী ব্যক্তি অন্যকে আঘাত করে চলে। অন্যকে আঘাত করে আনন্দ পায় সে। সে অন্যকে মানসিক পীড়া দেয়, বিদ্ধস্ত করে চলে তার উন্নাসিক আচরণে।

প্রতিপক্ষের মানুষটিরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং অনেক সময় তারাও আক্রমণাত্মক হয়েও উঠতে পারে। মারামারি ঝগড়া বিবাদেও জড়িয়ে পড়ে অনেকেই। আর দুজন অহংকারী মানুষ পরস্পরের সম্মুখীন হলে তো কথাই নেই- দ্রুত বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। বাকযুদ্ধ থেকে হাতাহাতি মারামারি তো হতেই পারে। সমাজে এদের কেউই পছন্দ করে না।

অহংকারী মানুষ সবসময়ই মানসিক বিকারগ্রস্থ থাকে। মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্ত ভাব বিরাজ করে। একটি আমিত্ব কাজ করে। এরা প্রচণ্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তার আমিত্বই তার ধ্বংস ডেকে আনে। আমিত্ব থেকে জন্ম নেয় দম্ভ। তারা অস্থিরচিত্তে থাকার কারণে তার সংস্পর্শে যারাই আসে তাদেরও অস্থির করে তোলে। তারা ঝগড়াটে প্রকৃতির হয়। অন্যের সঙ্গে কারণে অকারণে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তার মধ্যে একটা ধারনা জন্মে যে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, সেই প্রকৃত জ্ঞানী আর অন্যরা তাকে ঠিক মূল্যায়ন করতে পারছে না। এরা অন্যদের অপমান করে আনন্দ পায়। কটু কথা বলা এদের অভ্যাস।

এসব কারণে সে অনেক ক্ষেত্রে অপমান অপদস্থও হয় তেমন মানুষের পাল্লায় পড়লে। সমাজে সকলের মধ্যেই এরা একা হয়ে পড়ে। সকলেই তাকে দেখলে কিভাবে তাকে এড়িয়ে চলবে সেই প্রবণতা দেখা যায় সকলের মধ্যে, এসব লোককে দেখলে শান্তিপ্রিয় মানুষদের মধ্যে একটা পালাই পালাই ভাব তৈরি হয়। দু'একটা প্রশংসা বাক্য শুনিয়ে সরে পড়ে আর অন্যদের নিকট গিয়ে গল্প করে, 'বাবা, বাঁচলাম।'

অহংকারী মানুষদের মধ্যে শারীরিক সমস্যাও দেখা যায়। এদের অনেক শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেশি হয়। এমনও হয় যে সেই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে ডাক্তার বাবুকেও বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ অহংকারী মানুষ সবসময়ই একটা স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে থাকে, এমনকি ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করে।

তরুণবাবু ব্যারাকপুর পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। এই চাকরির সুবাদেই তার যথেষ্ট অহংকার-পৌরসভার সকলে তাকে সেভাবেই জানে। তিনি ভাবেন তার অনেক জ্ঞান এবং অনেকেই সঠিক জানেনা। তরুণবাবু ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের উপর নিজের মতামত প্রয়োগ করে নিজের মত ওষুধ খান। তিনি অসুখ হলে ডাক্তার দেখাবেন কিন্তু তিনি সহজে সব ওষুধ খাবেন না।

তার ধারনা ডাক্তারও ঠিক মত দেখেননি অথবা সঠিক ওষুধ লেখেননি। তার মধ্যে এ ধারনাও থাকে যে এই ডাক্তারবাবু যাকে দেখালাম তিনিও ভালো জানেন না। তিনি ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ডাক্তারের নিকট তার শারীরিক সমস্যা বলার পর ওষুধের ব্যাপারেও নিজে মতামত দিতে থাকেন। গুগল ঘেঁটে অনেক সময়ই

তিনি ডাক্তারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কোন কোন ডাক্তার একবার যারা তরুণবাবুকে চেনেন জানেন দ্বিতীয়বার তাঁদের কাছে আসলে তাকে এড়িয়ে চলেন। তিনি ডাক্তারের চেম্বারে এমন ব্যবহার করেন এমনভাবে বকবক করতে থাকেন যার ফলে সুস্থমনে ডাক্তারকে প্রেসক্রিপশন করতে পর্যন্ত দেন না।

এ ধরণের মানুষ নিজের ও নিজের পরিবারের ক্ষতি করেন ও রোগের জটিলতা তৈরি হয়। এরা সুস্থ হন না সহজে। ডাক্তারের জ্ঞান সম্বন্ধে এতই সন্দিহান থাকে যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সঠিকভাবে অনুসরণ করেন না। ভাবেন, মনে হয় ডাক্তারবাবু ভুল ওষুধ লিখেছেন। তখন ওই প্রেসক্রিপশনের উপর নিজে আবার বুদ্ধি প্রয়োগ করেন।

তরুণবাবু ফার্মেসিতে গিয়ে সেখানে বলেন, 'এ ওষুধটা দিতে হবে না, ওটা দরকার নেই, একটু কম পাওয়ারের দিন। আমার এত পাওয়ারের ওষুধ লাগবে না। এত ওষুধও লাগবে না। তিন দিনের ওষুধ দিন।' ডাক্তারবাবু আমার অসুখ সঠিক ভাবে বোঝেননি তাই একগাদা ওষুধ লিখেছেন। আমরা সব বুঝি, একটাতে কাজ না হলে অন্যটাতে কাজ হবে।

আর ডাক্তারের নিকট গিয়ে তরুণবাবু বলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার অসুখের কিছুই কমেনি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি যে ওষুধ লিখেছিলাম, সব ওষুধ খেয়েছেন?'

-'হ্যাঁ, আমি সব ওষুধ খেয়েছি, কিন্তু এক ফোঁটা কাজ হয়নি আপনার ওষুধে। একগাদা টাকা খরচা করেও কোনই উপকার হল না। ডাক্তারবাবু বুঝে উঠতে পারছেন না- 'ওষুধ লিখলাম, ঠিকমত উপকার হওয়ার কথা। তাহলে কি আমিই ভুল করলাম? গণ্ডগোলটা কোথায় হতে পারে? তাহলে কিছু টেস্ট করে দেখা যাক সমস্যাটা কোথায়।'

তরুণবাবুকে তিনি রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা লিখে দিলেন। বাইরে বেরিয়ে তরুণবাবু বললেন, রোগ ধরতে পারছেন না। আবার একগাদা টাকা খরচা হবে।

তরুণবাবু ল্যাবে গেলেন। ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসান দেখালেন। ডাক্তারবাবু যে যে টেস্ট লিখেছেন তার উপরেও বললেন, 'থাইরয়েডটা করে দিন, লিপিড প্রোফাইল, লিভার ফাংসান এগুলো করে দিন। রক্তের গ্রুপটাও করি।' ল্যাবে বিল হল পাঁচ হাজার টাকা। বাইরে এসে তরুণবাবু বলতে থাকেন, 'ফালতু আমার পাঁচ হাজার টাকা খরচা করালেন।'

এভাবেই অহংকারী মানুষের নির্বুদ্ধিতার জন্য এরা বেশি ভোগেন, বেশি টাকা খরচা হয়। অহংকারী মানুষ সবজান্তা হয়। ফলে বিপত্তি বাধে।

এসব মানুষের ক্ষুধামান্দ্য, শরীরের ওজন হ্রাস বা অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি ও

অনিদ্রা খুব বেশি হয়। এরা যে কোন কাজে দ্রুত হাত দেয় আবার দ্রুত সেই কাজে অনিচ্ছা শুরু করে দেয়। বলতে শুরু করে এ কাজটি তার পক্ষে অসম্মানের বা কাজটি নিম্নমানের । এরা কাজটি অসম্পূর্ণ রেখেই অন্য কাজে হাত দেয়। এদের সব কাজেই বড়ো অনীহা। এরা সব সময়েই অমনোযোগী ও খিটমিটে স্বভাবের হয়। কোন কাজই সে সম্পূর্ণ করতে পারে না। একটি কাজ শেষ না হতেই অন্য কাজে হাত দেয়। একটা অতৃপ্তি আর অশান্তি এদের মন আর শরীর ঘিরে থাকে।

অহংকারী মানুষদের মধ্যে যৌন ক্ষুধা বেশী থাকে তার স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে। অন্যদিকে এরা জটিল মনঃস্তত্বের কারণে নিজের স্ত্রীর নিকটও সে সহজ হতে পারে না। স্ত্রীর নিকট প্রেম নিবেদন করতেও তার অহংবোধে বাধে। তার দৈহিক চাহিদার কথা, যৌন পছন্দের কথা সহজভাবে স্ত্রীকেও বলতে পারে না।

অহংকারী মন প্রেম নিবেদন করতে পারে না, পাছে ছোটো হতে হয়। তাই শয্যাতেও সে থাকে আড়ষ্ট। অথচ যৌনক্ষুধা তার শরীরে। অহংকারের কারণে স্ত্রীকেও বলতে দ্বিধাগ্রস্ত তার ইচ্ছার কথা, শরীরের চাহিদার কথা। এ ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকেও রাতের শয্যায় অপমানিত করতে ছাড়ে না। যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত না করেই বিনিদ্র রাত কাটে দুজনের।

অহংকারী মানুষেরা কোনরূপ ভূমিকা ছাড়াই মিলিত হয় স্ত্রীর সঙ্গে ও নিজের প্রয়োজন মিটিয়েই পাশ ফিরে ঘুমোয়। তার স্ত্রীরও থেকে যায় যৌন অতৃপ্ত। বিতৃষ্ণার কারণে দূরত্ব বেড়েই চলে দুজনের মধ্যে। এই ব্যাপারটা বিপরীত ভাবেও ঘটতে দেখেছি।

অহংকারী স্ত্রীও একই রূপ ব্যবহার করে তার স্বামীর সঙ্গে। পরিণতি অপমান আর দূরত্ব বৃদ্ধি। এখানেই লুকিয়ে থাকে পরকীয়ার বীজ। অহংকারী মানুষকে পরপর কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে পরকীয়াতে প্রবেশ করতে দেখা যায়। বিবাহ-অপমান-অতৃপ্তি-অশান্তি-পরকীয়া-এটা হচ্ছে পরপর ধাপ। পরকীয়াতে কোন ব্যক্তি, নারী হোক বা পুরুষ হোক কেউ খুব শান্তিতে থাকে তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। সেখানেও সেই একই টানাপোড়েন-অহংকার। সঙ্গীর সাথে শুরু হয় বিতর্ক, তুলনা আর অপমান।

পরকীয়ার মানুষ সব সময়ই ভিতরে একটা আকুতি থাকে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার। ফিরে আসেও- প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রে এরা ফিরে আসে, যখন দেখে এখানে তার অহংকার বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না তখন। ব্যতিক্রম যে থাকে না তা নয়। এক পরকীয়ার সঙ্গী থেকে সঙ্গী বদল ঘটিয়ে নতুন সঙ্গী সন্ধান করে। এটা অনেক সময় পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

সঙ্গী বদল হতে থাকে। এদের পরিণতিও ভয়াবহ। এরা আত্মহত্যা করতে পারে বা এরা অন্যের হাতে খুন হতে পারে। এসকল মানুষ অনেক সময় নিরুদ্দেশ

হয়েও যায়। আর এক ধরণের মানুষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিয়ে করে নেয়। সে সব বিয়েও টেকসই হয় না স্বাভাবিক কারণেই। এদের বিচ্ছেদ ঘটে এক সময়। অহংকারী মানুষ কোথাও স্থির হতে পারে না। না নিজের সংসারে না অন্যত্র। এরা অতৃপ্তি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।

পরপর পরকীয়ার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক হতে বাধ্য। সংসারে হয় বিচ্ছেদ না হয় খুন, না হয় যাবজ্জীবন কারাবাস।

যৌনক্ষুধার স্বাভাবিক নিবৃত্তি না হলে শরীরে ও ব্যবহারে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। যৌন নিবৃত্তি না হলে সে বিকৃতিতে ভোগে। সমকামী হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। পৃথিবীর অনেক নামকরা অহংকারী ব্যক্তিরাও এসব যৌন বিকৃতিতে ভুগতেন বা ভোগেন, এদের তালিকায় আছেন অনেক নামী গায়ক, লেখক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড় প্রভৃতি।

অনেক ক্ষেত্রে এদের যৌনবিকৃতির শিকার বাড়ির দুর্বল মহিলা, কাজের মেয়ে, অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরী, এমনকি বৃদ্ধা মহিলাও হতে পারে। স্বমেহন বা পশুমেহন প্রভৃতি এই অহংকারী ব্যক্তিদের বেলায় অনেক গল্প শোনা যায়।

আশ্চর্য এই যে এসব লোকের কোন স্থায়ী বন্ধু বা বান্ধবীও থাকে না, প্রেমিকাও হয় না। এদের প্রাথমিক অহংকার বা কেতাদুরস্ত ভাব দেখে সহজেই মেয়েরা আকর্ষণ বোধ করে, তার সংস্পর্শ লাভে ব্যাকুল হয়। কাছেও আসে দ্রুত। এসব মেয়েদের মোহভঙ্গ হতে সময় লাগে না। পদে পদে অপমানিত হতে হতে একসময় দূরত্বে চলে যায়।

নিজের অহংকারে আঘাত লাগবে বলে এরা কোন মহিলাকে বন্ধুত্ব বা প্রেমের জন্য নিবেদন করতে পারে না নিজ থেকে। তেমন ব্যাপার অহংকারী মহিলার ক্ষত্রেও ঘটে। এদের কোন বন্ধু থাকেনা, পুরুষ বন্ধুতো থাকেই না। কোন পুরুষ এদের নিকট প্রেম নিবেদন করলে অথবা নিছক বন্ধুত্বের আবদার করলেও তাদের ফিরিয়ে দেয়, অপমানও করতে দেখা যায়। অন্য সহকর্মীদের বলে, 'কি সখ! দেখো, আমার সঙ্গে ভাব করতে চায় লোকটা। আমার পাশে দাঁড়ানোর কোন যোগ্যতা আছে ওর?'

এই মহিলারাও অনেক সময় যৌনবিকারে ভোগে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কমবয়সী ও ব্যক্তিত্বহীন পুরুষদের এরা ব্যবহার করে থাকে। নিকট আত্মীয়ও বেছে নেয় নিজের যৌন নিবৃত্তির জন্যে। গাড়ির ড্রাইভার, কাজের লোক অথবা জিগোলোদের অর্থ দিয়ে শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে শোনা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিষয়টা সহজ হয়ে গিয়েছে যৌনসঙ্গী সংগ্রহে। অহংবোধের কারণে এত কিছুর পরও এরা বরাবর অতৃপ্তই থেকে যায়। এদের বিকৃতি এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে যৌনসঙ্গীকে অপমানিত করে বা যৌনক্রীড়ার সময় সঙ্গীকে শারীরিক আঘাত

করেও আনন্দ খোঁজে। এরা নিজের কোমল অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে, প্রণয়ের ভাষাকে দমিত করে শুধুই অপমান করার ঝোঁকে বেশি তাড়িত হয়। জলন্ত সিগারেট দিয়ে সঙ্গিনীর গায়ে ছ্যাকা দিয়েও মজা পায় অনেকে।

পুরুষ বা নারী হোক এরা অনেক ক্ষেত্রে সমকামী হওয়ার সংখ্যা নেহাত কম নয়। এদের কার্যকলাপের কাহিনী শুনলে আমরা দিশেহারা হয়ে যাব, হতচকিত হয়ে যাব। এরা সবই করে চলেছে লোকচক্ষুর আড়ালে পাছে এদের অহংকারে আঘাত লাগে।

বেশির ভাগ ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না। এমন অনেক ক্ষেত্রে রোমহর্ষক খুনের ঘটনা অহংকারী যৌন বিকারগ্রস্তদের দ্বারা অথবা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তার দুই একটি সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে মিডিয়ার দৌলতে। মিডিয়া যখন শক্তিশালী ছিল না তখন এসব ঘটনা চাপা পড়েই থাকত।

একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কলকাতা সল্টলেকের বাসিন্দা রমানাথবাবু বেশ ডাকসাইটে লোক। বড়ো চাকরি, গাড়ি বাড়ি প্রতিপত্তি এক কথায় সব আছে তার। তার একমাত্র ছেলে অবিনাশ আইআইটির মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। সে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সবে ভালো চাকরি পেয়েছে। বাবা ও ছেলে দুজনেই যথেষ্ট অহংকারী চরিত্রের মানুষ।

এদের কারোই বন্ধু বান্ধব না থাকলেও আশেপাশে লোকজনের অভাব নেই অনুকম্পা ও প্রসাদলাভের আশায়। ভালো চাকরি যখন, ভালো মেয়ের খোঁজ শুরু হল ছেলের বিয়ের জন্য। নামকরা ওয়েবসাইট- শাদী ডট কম ও ম্যাট্রিমনি ডট কম এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হল- ‘উচ্চশিক্ষিতা বনেদি পরিবারের চাকুরিরতা সুন্দরী ব্যক্তিত্বসম্পন্না স্মার্ট মেয়ে চাই।’ অনেক খুঁজে পাওয়াও গেল টালিগঞ্জের বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে ললিতাকে। মাস্টার্স ও এমবিএ করা। অনেক খরচ করে বিয়ে দেওয়া হল। পুত্রবধু ললিতা সে ও বড়ো কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে, ভালো বেতন। সংসার যথারীতি সুখেই শুরু হল।সকালে খেয়েই দুজনেই অফিসে বেরিয়ে পড়ে।

দুজনের অফিস দু’ দিকে। অবিনাশের সেক্টর ফাইভে। ললিতার পার্ক স্ট্রিটে। দুজনে দুজনের আলাদা গাড়ি নিয়ে অফিস করে। অবিনাশ নিজে ড্রাইভ করে আর ললিতার নতুন ড্রাইভার শশী। বছর বাইশের যুবক। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফেরে ওরা। তারপর হাতমুখ ধুয়ে একসাথে চা পান, গল্প হাসি। একটু টেলিভিশনের সামনে বসা। যেমন নবদম্পতির হওয়ার কথা তেমনই।

দিন গড়িয়ে মাস গেল। আকাশে মেঘ দেখা গেল। সে মেঘ কখনো পরিষ্কার কখনো ঘন কালো। আস্তে আস্তে প্রকাশ পেল দুজনেই যথেষ্ট অহংকারী মানসিকতার। একটি কথা এখনই বলে রাখতে ইচ্ছে করছে, এ কথা ভাববার

কোন কারণ নেই যে উঁচু পরিবার ও শিক্ষিত হলেই সকলে অহংকারী মানসিকতার হয় না। ধনী বা দরিদ্র এসব নয়, যে কোন পরিবারের পুরুষ মহিলা যে কেউ এমন হতে পারে। ধনী মানেই অহংকারী তা নয়—এদের মধ্যে অনেক অমায়িক ভদ্রলোকেরও ভদ্রমহিলার দেখা মেলে।

যে কথা বলছিলাম- অবিনাশ ও ললিতার সংসার অফিস চাকরি নিয়ম মাফিক চলছিল। অহংকারী মানুষেরা বিয়ের আগে অদ্ভুত ভাবে ভালো পাত্র বা ভালো পাত্রী খোঁজে। তারপর সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে শুরু হয় আধিপত্য,'আমিই বা কম কিসে?' অবিনাশ ও ললিতার মধ্যে মৃদু অনুযোগ দিয়ে সেই পর্ব শুরু, আমার চাকরির ক্ষেত্রে আমার গুরুত্ব কম নয়।

আস্তে আস্তে অহংকার বাসা বাঁধতে শুরু করল ওদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যিখানে। বাড়তে থাকে দূরত্ব। বাইরের কেউ জানতে বা বুঝতে পারেনি যে ওদের মধ্যে বীজ বপন হয়েছে দূরত্বের- চাপা অশান্তির। সে দূরত্বের ইন্ধনদাতা একমাত্র অহংকার। অহংকার হচ্ছে ক্যান্সারের মত। ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে খায় আর সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে সর্বনাশা পথে এগোতে থাকে।

ওদের দুই পরিবারের কেউই জানতে বুঝতে পারেনি ওদের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম বিভাজন রেখা তৈরি হয়েছে। ওরা বেড়াতে যায়, রেস্টুরেন্টে খেতে যায়, বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যায়, বছর বছর ঘুরতে যায়- সবই তো ঠিক আছে মনে হয় সকলের। গণ্ডগোল নেই কোথাও। এ গণ্ডগোল গভীরে- অন্তরের অন্দরে। না কোন ডাক্তার না কোন মনঃস্তত্ববিদ এটা ধরতে পারবেন সহজে। সকলে প্রশ্ন করতে শুরু করল, 'বিয়ের তিন বছর হয়ে গেল কোন সন্তানাদির দেখা নেই কেন?' রমানাথবাবু হেসে হালকা করেন, 'হবে হবে। এত তাড়া কিসের?'

কিন্তু এত দিনে কঠিন ভাবে দুজনের মধ্যে অহংকার স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। অবিনাশ আর ললিতার মধ্যে শীতল সম্পর্ক রমানাথবাবু হয়ত অল্প স্বল্প আঁচ করতে পেরেছেন ইদানিং। যে টুকু আঁচ করেছেন তার চেয়ে বেশিই বেড়েছে হয়ত দুজনের দূরত্ব। সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য না করলে বাইরের কেউই বুঝবে না খুব একটা। বরং ভাববে বাহ্ দুজনের তো বেশ মিল, বেশ ভাব। মন কষাকষি বাড়লে ললিতা টালিগঞ্জে তার বাবার বাড়ি চলে যায় নিজের গাড়ি আর ড্রাইভার শশীকে নিয়ে, শ্বশুরমশাই রমানাথবাবুকে বলে গেল, 'বাবা আমি একটু টালিগঞ্জের বাড়ি যাচ্ছি।'

রমানাথবাবু বললেন, 'ললিতা, অবিনাশকে বলেছ? ও কি জানে?' কোন উত্তর দেয় না ললিতা। বেরিয়ে পড়ে বাপের বাড়ির দিকে। সেখান থেকেই তার অফিস করে। অবিনাশও ললিতার খোঁজ খবর নেয় না, তার মত চলতে থাকে। খেয়াল খুশি মত ললিতা আবার এ বাড়ি চলে আসে সঙ্গে থাকে তার গাড়ি আর গাড়ির বাইশ বছরের ড্রাইভার শশী।

ললিতা যেখানেই যায়- শপিং মল, বিউটি পার্লার, অফিস, সেমিনার বন্ধুর বাড়ি শশী সঙ্গে যাবে গাড়ি নিয়ে। কিছুদিন হল ললিতার ঘন ঘন বাবার বাড়িতে যাওয়া বেড়ে গেছে। সঙ্গে যায় ড্রাইভার শশী। সকলেই জানে বয়সে অনেক ছোটো শশীকে ললিতা খুব স্নেহ করে। শশীও ম্যাডাম বলতে এক পায়ে খাঁড়া, কোথাও যেতে বললেই রাজি, কিছু কাজের কথা বললে খুশি মনে সব করে।

ললিতার বাবা অধীরবাবু একদিন রমানাথবাবুকে ফোন করে বললেন যে তিনি খুব অসুস্থ, যদি একবার আসেন। রমানাথবাবু ইতস্তত করেও ললিতার বাবাকে দেখতে গেলেন একদিন। রমানাথবাবুর হাত চেপে ধরে ললিতার বাবা অধীরবাবু বললেন, 'দয়া করে আমার মেয়েকে এভাবে একা একা আমার বাড়িতে পাঠাবেন না। আসলে যেন জামাই মেয়ে একসঙ্গে আসে আবার একসঙ্গে ফিরে যায় ওরা।'

এরপর অধীরবাবু যা বললেন সেটা শুনে রমানাথবাবু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এ বাড়িতে এসে ললিতা আর শশীর আচরণ ও চালচলন ওর বাবার ভালো লাগেনি। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়েছে। ললিতা ওর বাবা মাকে বলেছে, 'আমি এমন কিছু করছি না যে তোমাদের সম্মানহানি হবে। আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। আমি কি করব না করব সেটা আমার ইচ্ছা। এ বাড়িতেও আমার অধিকার আছে।' মেয়েকে আর কিছু বলতে পারেননি অধীরবাবু।

অধীরবাবু এও জানালেন-এখানে আসলে প্রায়ই অনেক রাত অব্দি শশীর সঙ্গে গল্প করে। কখনও কখনও গভীর রাতে শশীকে ললিতার ঘরে যেতে দেখেছে। বাবা মার নিষেধ শোনেনি ললিতা। এটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। লেখাপড়া জানা চাকুরীজীবী মেয়েকে কিই বা বলবেন। এ কথা অবিনাশের কানেও তুলেছিলেন রমানাথবাবু। এ নিয়ে অবিনাশের কোনই প্রতিক্রিয়া নেই পিছনে অহংকারে আঘাত লাগে। বরং অবিনাশ বলেছে যে সে ওদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখেনি যেটা নিয়ে ওকে বলতে হবে। তাছাড়া এটা নাকি ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়েওর কিছু বলা উচিত নয়।

অহংকারী মানুষেরা এভাবে নিজেদের সম্পর্ককেও জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করে না। অবিনাশের একটি ছোট্ট অনুরোধ, একটু ভালোবাসা মেশানো কথা সব সমাধান করে দিতে পারত। এখান থেকেও ললিতাকে ফিরিয়ে আনতে পারত। কিন্তু ওই যে অহংকার! সে কি করে ললিতাকে বলবে, 'ললিতা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ফিরে এসো।' এ কথা কি বলা যায়? ছোটো হয়ে যাবে না সে! সংসার মানে প্রতিদিনের আপস প্রত্যেকের সঙ্গে।

সংসার সুন্দর রাখতে যেখানে প্রতিদিন পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা মধুর সম্পর্ক রাখতে হয় এরা সেটাকে ছোটো হয়ে যাওয়া বলে জানে।

অহংকার সংসারে ভিতরে ভিতরে গ্রাস করে চলে, সব শেষ করে দেয়। রমানাথবাবুর বাড়ির ঘটনা এখানে থেমে থাকেনি। এমন চলতে থাকে দিনের পর দিন। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ললিতা ডাকাডাকি করল, শশী ডাক শুনছে না। রমানাথবাবুর বাড়িতে ড্রাইভারের জন্য ঘরে শশী থাকত। ঘরে ঢুকে দেখা গেল শশী নেই। সকলে ভাবল কোথাও বেরিয়েছে হয়ত। কিন্তু সারাদিন শশী বাড়ি ফেরেনি। তার মোবাইল সুইসড অফ। শশীকে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে ললিতা নিজেই থানায় গেল, মিসিং ডায়েরি করল। শশী কোথায় গেল, কি হল তা নিয়ে রমানাথবাবু কোন আগ্রহ দেখাননি বরং আশ্চর্য রকম উদাসীন ছিলেন সারাদিন। অবিনাশও তেমনি উদাসীন।

অনেক দিন গত হয়ে গেল আজও শশীর সন্ধান মেলেনি। বাড়ির কাজের মাসি স্বগতোক্তি করেছিল একদিন, ‘এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু হবে আমি আগেই বুঝতে পারছিলাম।’ শশীকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছিল নাকি সে গৃহত্যাগী হয়েছিল জানা গেল না। সম্মানহানির ভয়ে অথবা নানা অপমানকর গসিপ ছড়াতে পারে তাই ললিতাও চুপ করে গেল।

সমাজ সংসারে এরকম অনেক রকম ঘটনা ঘটে যা প্রকাশ্যে আসে না, সকলের অলক্ষ্যে থেকে যায়। ঘুণাক্ষরে কেউ কিছু জানতেও পারে না। যখন ঘটনা প্রকাশ্যে আসে তখন প্রতিবেশীরা দেখেন যে পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা তখন চোখ কপালে তোলেন এই ভেবে যে, এই লোকটি অহংকারে পাড়ার কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না, আর এমন কাজ করতে পারল? এরা সমাজে থেকেও সমাজ বহির্ভূত জীব।

অহংকারীর ব্যক্তির আচার ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংসারেরে অন্য সদস্যদের মধ্যেও পড়ে। একটি অহংকারী ব্যক্তির জন্য সমগ্র সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। অহংকারী মানুষদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈনন্দিন আপোষের একটা অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় এরা তা মানতে পারে না।

পরস্পরকে সম্মান করতে হয়, এরা ভাবতেই পারে না। প্রতিনিয়ত এঁকে অন্যকে ছোটো করার জন্য আঘাতপ্রাপ্ত হতে হতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় যার ফলশ্রুতি বিবাহবিচ্ছেদ। এরা নিজের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করতে জানে না। সংসার টিকিয়ে রাখতে গেলে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা সমঝোতার মানসিকতা নিয়ে চলতে হয় সেটা এরা মানতে পারেন না।

অহংকারী মানুষদের কোন বন্ধু হয় না। বন্ধু হলেও দ্রুত বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়। প্রথম প্রথম দুই একজন হয়ত আকৃষ্ট হয়ে ভাব করতে গেল কিন্তু অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হয় এবং এড়িয়ে চলতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হল এসব মানুষদের যে কোন বন্ধু নেই সেটাতেও এরা অহংকার বোধ করেন।

এরা গর্বের সঙ্গে বলে থাকেন, ‘জানেন, আমার কোন বন্ধু নেই? এসব বন্ধু টন্ধু আমার ভালো লাগে না। এসব পোষায় না আমার। এই যে একা আছি ভালো আছি।’ বন্ধুহীন থাকাতেই যেন কত শান্তি, কত গর্বের। এরা কখনও কোথাও আর পাঁচ জনের সাথে চায়ের আড্ডায় বসতে পারে না। সেটা ওদের কাছে মনে হবে ছ্যাবলামো, ন্যাকামো।

যদি কেউ ধরে বেঁধে বলে,‘চলুন একত্রে বসে আমরা চা খাই।’ কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকবে ওই ব্যক্তি। সকলকে অপ্রস্তুত করে অস্বস্তিতে এক পর্যায়ে উঠে চলে যাবে চায়ের আসর ছেড়ে- সকলকে অপমান অপদস্থ করে।

এসব মানুষের বাড়িতে তার কোন আত্মীয় বা পরিচিতরা বেড়াতে আসেন না। এ সকল কারণে বাড়ির ছোটো শিশুরা বেড়ে ওঠে নাজুক পরিবেশে, এদের মানসিক বিকাশ ঠিকমত হয় না বরং এদের মধ্যেও সংক্রমিত হয় অহংকার। লক্ষ্য করে থাকবেন এরাও বড়ো হয়ে তার বাবা বা মায়ের মতোই হয়, এবং একই ঢঙ্গে এরা হয়ে ওঠে অহংকারী আর অসামাজিক।

অহংকার এক সাঙ্ঘাতিক মানসিক ব্যাধি। যারা অহংকারী তারা সেটা মানবেই না যে এটা তার কোন মানসিক বিকার। এরা আপাত এক স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। পোশাকে এরা ধোপদুরস্ত, কথাবার্তায় এরা চোস্ত। বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না যে তার মধ্যে এমন একটা মানসিক দুরবস্থা বিরাজ করছে। তাই তার কাউন্সেলিং বা পরামর্শ করে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করাও কঠিন, যদি তার মধ্যে উপলব্ধি না আসে যে তার এই মানসিকতা সকলের ক্ষতি করছে। আত্মোপলব্ধিই অহংকার থেকে মুক্তির সঠিক পথ। তার বোধে আসা প্রয়োজন যে অহংকারই তার সকল বিপর্যয়ের মূলে, তার পতনের একটি কারণ।

Egoism can be a descriptive or a normative position. Psychological egoism, the most famous descriptive position, claims that each person has but one ultimate aim: her own welfare. Normative forms of egoism make claims about what one ought to do, rather than describe what one does do. Ethical egoism claims morally ought to perform some action if and only if, and because, performing that action maximizes my self-interest. Rational egoism claims that ought to perform some action if and only if, and because, performing that action maximizes self-interest.

Psychological Egoism: All forms of egoism require explication of "self-interest". There are three main theories. Preference or desire accounts identify self-interest with the satisfaction of one's desires. Often, and most plausibly, these desires are restricted to self-regarding

desires. What makes a desire self-regarding is controversial, but there are clear cases and counter-cases: a desire for my own pleasure is self-regarding; a desire for the welfare of others is not. Objective accounts identify self-interest with the possession of states that are valuable independently of whether they are desired. Hybrid accounts give a role to both desires and states that are valuable independently of whether they are desired. For example, perhaps the increase to my well-being brought about by a satisfied desire itself increases insofar as it is a desire for knowledge. Or perhaps the increase to my well-being brought about by a piece of knowledge itself increases insofar as desire it. Hedonism, which identifies self-interest with pleasure, is either a preference or an objective account, according to whether what counts as pleasure is determined by one's desires.

Ethical Egoism: Ethical egoism claims that morally ought to perform some action if and only if, and because, performing that action maximizes my self-interest. There are possibilities other than maximization. One might, for example, claim that one ought to achieve a certain level of welfare, but that there is no requirement to achieve more. Ethical egoism might also apply to things other than acts, such as rules or character traits. Since these variants are uncommon, and the arguments for and against them are largely the same as those concerning the standard version, set them aside.

Rational Egoism: Rational egoism claims that ought to perform some action if and only if, and because, performing that action maximizes my self-interest. As with ethical egoism, there are variants which drop maximization or evaluate rules or character traits rather than actions. There are also variants which make the maximization of self-interest necessary but not sufficient, or sufficient but not necessary, for an action to be the action ought to perform. Again, set these issues aside. Rational egoism makes claims about what ought, or have reason, to do, without restricting the "ought" or "reason" to a moral "ought" or "reason."

Egoism require moral agents to harm the interests and well-being of others when making moral deliberation. It is in an agent's self-interest may be incidentally detrimental, beneficial, or neutral in its effect on others. Egoism allows for others' interest and well-being to be disregarded or not, as long as what is chosen is efficacious in satisfying the self-interest of the agent.

Egoism necessarily entail that, in pursuing self-interest, one ought

always to do what one wants to do. In the long term, the fulfilment of short-term desires may prove detrimental to the self. In the words of James Rachels, egoism endorses selfishness, but it doesn't endorse foolishness.

Egoism is often used as the philosophical basis for support of right, libertarianism and individualist anarchism. These are political positions based partly on a belief that individuals should not coercively prevent others from exercising freedom of action.

হিংসা
(Jealous)

একই সঙ্গে মানুষের মনে ধর্ম আর অধর্মের সহ অবস্থান। প্রত্যেকের মনেই এই দুইয়ের অধিবাস পাশাপাশি। ধর্ম আর অধর্ম এই দুইই প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। যখন মানুষ উন্নত চিন্তাধারার অবস্থানে বিরাজ করে তখন ধর্ম থাকে তার সারথী, তার অভিভাবক। আর যখন মানুষের অবনতি ঘটে তখন অধর্ম হয়ে ওঠে তার একান্ত বন্ধু একনিষ্ঠ সহচর।

মানুষের এক সহজাত অধর্ম হচ্ছে হিংসা, এটা এক সহজাত প্রবৃত্তি। তাই বলে সকলেই কি হিংসা করছে সব সময়? মোটেই না। মানুষের ভিতরেই আছে অধর্মকে দমন করা স্বতঃপ্রবৃত্ত শক্তি।

হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ সদা সর্বদা কিছু মানুষ অনুভব করে। হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় অনুযায়ী এবং পারিপার্শ্বিক উত্তেজনায়।

ঈর্ষার পরের ধাপই হল হিংসা। ঈর্ষা প্রকাশ পায় না অনেক সময় কিন্তু হিংসা মন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আর আক্রমণ করে পাশে বসা মানুষটিকে। হিংসা মানুষের কন্টকাকীর্ণ এক অন্ধকার অবস্থান। হিংসা প্রদর্শন করে চলতে থাকলে মানুষ তার নিজের যাত্রাপথেই কাঁটা বিছিয়ে চলতে থাকে। যখন সেই মানুষটি ফিরে আসতে চায় তার পুরনো ঘরে তাকে তার নিজের কাঁটা বিছানো পথেই রক্ত ঝরিয়ে ফিরতে হয়। অনেক সময়ে ফিরতে পারে না স্বস্থানে। তার স্বজন তাকে প্রত্যাখ্যান করে- তার স্বভূমি তাকে গ্রহণ করতে চায় না। হিংসাশ্রয়ী মানুষ নিজেই নিজের বধ্যভূমি রচনা করে।

অন্যের ভালো এমন কিছুতে মনে জন্ম নেয় ঈর্ষার। আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, আশা, ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ, হিংসা- এগুলো মানুষের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া। একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে মনের যাতায়াত প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনের যে কোন একটি অবস্থানেই সুস্থির থাকার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলে—একটি আবেগ থেকে অন্য একটি আবেগের ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে ভাবে কিছুক্ষণ। নিজের মনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন তারা। ঈর্ষা অবদমিত

না হলে ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রূপান্তরিত হয় হিংসায়। অনেক মানুষই জ্ঞানত অথবা নিজের অজান্তেই পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠে। অন্যের যে কোন সুন্দর বা ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে একটা তুলনামূলক অবস্থানে চলে যায় মানুষ। শুরু হয়ে যায় কে ভালো কে মন্দ তার পার্থক্য নির্ণয়।

পরশ্রীকাতর বিক্রিয়াটি আমাদের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে প্রতিমুহূর্তে। আবার আমরাই নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছি। সৃষ্টির আদি থেকেই চলছে আধিপত্যবাদ। কে কাকে টপকে যাবে সেই প্রতিযোগিতা চলছে। আস্তে আস্তে মানুষ অন্য সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল।

মানুষের মধ্যেও আধিপত্যের প্রতিযোগিতা চলছে একে অন্যের উপর। আর সেখানেই কাজ করে ঈর্ষা ও হিংসা। একেবারে দুর্বলের উপর কেউ আধিপত্য বিস্তারে শক্তি ব্যয় করে না, তাকে শোষণ করে শক্তি ছাড়াই। এক অধিপতি আর এক অধিপতির উপর ঈর্ষান্বিত হয়, হিংসান্বিত হয়। একজন রাজা আর এক রাজাকে আক্রমণ করে। দুর্বল প্রজাকে আক্রমণের কথা ভাবে না। রাজা পাশের রাজ্যের রাজাকে হিংসা করে, সে রাজ্যের প্রজাদের হিংসা করে না।

ও বাড়ির উর্মিলাদেবী তার বাড়ির কাজের মাসিকে হিংসা করে না, হিংসা করে তার পাশের বাড়ির সুজাতা বৌদিকে। অর্থাৎ হিংসা চলে সমান্তরাল। বক্র বা তির্যক রেখায় নয়। এ ভাবেই ঈর্ষার লক্ষ্য বা হিংসার লক্ষ্য হয় প্রতিবেশী বা সহকর্মী বা একেবারে পাশের মানুষ। যারা দূরে থাকে তারা থাকে ঈর্ষার বাইরে, হিংসার আয়ত্বের বাইরে।

হিংসা একটি মানুষের সকল উন্নতির গতি রোধ করে দেয়। সুজাতা বউদি ভালো শাড়ি পড়লে উর্মিলাদেবীর হিংসা হয়। সুজাতা বউদির ছেলে ভালো স্কুলে ভর্তি হলে উর্মিলাদেবীর হিংসা হয়। সুজাতা বউদি পুরোনো টিভি পাল্টে নতুন ছাপ্পান্ন ইঞ্চি এল ই ডি টিভি বাড়ি আনলে উর্মিলাদেবীর হিংসা হয়- সারা রাত ঘুম আসে না।

এমনকি সুজাতা বউদি অসুস্থ হয়ে নামী দামি নার্সিং হোমে ভর্তি হলেও উর্মিলাদেবীর হিংসা-'কেন সে নামী নার্সিং হোমে ভর্তি হল?' এ এক অদ্ভুত অথচ প্রাত্যহিক প্রতিক্রিয়া উর্মিলাদেবীর। উর্মিলাদেবীর কি নেই, সব আছে। সুজাতা বউদির যা আছে উর্মিলাদেবীর তার চেয়ে কিছু বেশিই আছে। সব থাকলে কি হবে? সুজাতা বউদির ভালো কিছু তার ভালো লাগে না, হিংসা হয়। এটা তার এমন বিক্রিয়া যেন আর সব কাজ বাদ দিয়ে এটাই সবার আগের ভাবনা।

দিন যায়, উর্মিলাদেবীর সারাদিন মাথার মধ্যে সুজাতা বউদি, উর্মিলাদেবীর সারাদিনের মাথা ব্যথা সুজাতা বউদি। নিজের কোন কিছুর দিকে খেয়াল দিতেও আজকাল আর মন বসে না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে উর্মিলাদেবী

সারাদিন কান খাড়া করে বসে থাকে ও বাড়ি থেকে কোন খবর আসে কিনা, রাস্তায় চোখ লাগিয়ে বসে থাকে ও বাড়িতে কে গেল, কি গেল, কেন গেল- সব কিছুতেই যেন তার হিংসা।

উর্মিলাদেবীর কিছুই ভালো লাগে না। উর্মিলাদেবীর স্বামী বিদ্যুৎবাবু সারাদিন পরিশ্রম করে অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেই একগাদা ফিরিস্তি, একগুচ্ছ অভিযোগ ‘জানো, সুজাতা বউদির বাড়িতে আজ ও পাড়ার মিনা কাকিমা এসেছিল। প্রায় দুই ঘন্টা ছিল। কেন দুই ঘন্টা থাকতে হবে? দুপুরে খাইয়ে দাইয়ে তারপর সুজাতা বউদি তাকে ছেড়েছে। গা জ্বলে যায় আদিখ্যেতা দেখলে। এসবের কোন মানে আছে বলো?’ পাঠকও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন আর ভাবছেন, ‘এর মধ্যে হিংসার কি হল?’ আর এদিকে বিদ্যুৎবাবুর এসব শুনতে ভালো লাগে না দিন শেষে বাড়ি ফিরে।

উর্মিলাদেবীর হিংসা এই যে সুজাতা বউদি ও মিনা কাকিমার এত সখ্যতা কেন? পাঠক লক্ষ্য করলে আপনাদের আশেপাশেও দেখতে পাবেন এমন অনেক মানুষ, এমন অনেক উর্মিলাদেবী। একটু লক্ষ্য করলে আপনিও দেখবেন আপনার আশেপাশেও এমন আকছার ঘটছে। হিংসার কোন কারণই নেই তবুও হিংসা। হয়ত আপনার ঘরেই ঘটছে শুধু লক্ষ্য করেননি এতদিন, আজ থেকে নজর দিন দেখতে পাবেন।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে উর্মিলাদেবীর স্বামী যদি উর্মিলাদেবীর এই রোজকার একই অভিযোগের কথায় কোন প্রতিক্রিয়া না দেখান তবে উর্মিলাদেবী ক্ষেপে যাবেন আর বলেই ফেলবেন,’ তুমি সুজাতা বউদির ব্যাপারে বরাবর দুর্বল, সে আমি লক্ষ্য করছি কিছুদিন। তার বিরুদ্ধে কোনকিছুই শুনতে চাও না, তার বিরুদ্ধে কিছু বললে তুমি একদম পাত্তা দাও না। ব্যাপারটা আমি অনেক দিন ধরেই দেখছি।’ স্বামী বেচারি কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করেন, কোনদিন চুপ করে শোনার ভান করেন।

আবার যদি তার স্বামীও হিংসা চর্চায় প্রশ্রয় দেন তবে উর্মিলাদেবীর হিংসা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাবে। আরও উৎসাহিত বোধ করবেন, শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই শক্তি বৃদ্ধি নিজের সঙ্গেই নিজের যুদ্ধ। নিজের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি ক্ষয়।

শুধু এটাই নয়। উর্মিলাদেবীর নিজের বাড়িতে কি নষ্ট হচ্ছে সেদিকে নজর নেই। সংসারে কোনটা প্রয়োজন সেদিকে খেয়াল নেই। ছেলে পড়ালেখা ঠিকমত করছে কিনা দেখার সময় নেই। ছেলের টিউশন মাস্টার কদিন আসে না সে খেয়াল নেই। খেয়াল শুধু ও বাড়ির দিকে, সুজাতা বউদির দিকে। কি পরল, কে আসল তার বাড়ি, কি খেল, কোন রঙের শাড়ি পরেছিল আজ- এসব নিয়েই হিংসা। অদ্ভুত এ এক বিকার।

মানুষে মানুষে যখন শুরু হল একের উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা, তখন শুরু হল দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব থেকে যুদ্ধ। সে যুদ্ধ হতে পারে স্নায়বিক, হতে পারে সম্মুখ সংঘর্ষ। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও শোষণও চলেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কখনও একক, কখনও গোষ্ঠী ভিত্তিক। হিংসা আর আধিপত্য বিরাজ করে হাত ধরাধরি করে।

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে শোষণ করছে বা দমন করছে, কখনও এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর চালাচ্ছে আধিপত্যবাদ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও সারা বিশ্বে কি ভয়ানক আকারে চলছে অত্যাচার নির্যাতন শোষণ- একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হবে।

হিংসা নিয়ে লিখছিলাম। হিংসা আলোচনার মধ্যে আপাতত সীমাবদ্ধ থাকাটাই সমীচীন হবে। না হলে আমি নিজেই খেই হারিয়ে ফেলব। আমি দেখেছি হিংসা এমনই এক মানবিক বিকার যা কখনও একা একটি মানুষের মধ্যে তৈরি হয়না। হিংসার জন্ম নিতে হলে প্রয়োজন অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি, চাই একটা প্রতিপক্ষ। সেই প্রতিপক্ষ যে চোখের সামনে উপস্থিত হতেই হবে এমন নয়। চোখের আড়ালেও প্রতিপক্ষ অবস্থান নিতে পারে এবং তাকে নিয়ে হিংসার আবহ সৃষ্টি করতে পারে। তুলনামূলক অবস্থা বা ভারসাম্যের তারতম্য থাকলেই মনের মধ্যে প্রথমে প্রস্তুত হবে একটা আপাত অশান্তি। অন্যের কোন ভালো সংবাদ বা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থান মনের মধ্যে তৈরি করে অস্থিরতা। অন্যের অপেক্ষাকৃত ভালো সংবাদ যা হতে পারে অর্থনৈতিক, বৈষয়িক বৈষম্য, এমনকি অন্য কারো মানসিক সুস্থিরতা ও সৃষ্টি করে অস্থিরতা।

এমন দেখেছি, কেউ যদি বলেন, আমি ভালো আছি,—ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। এই ‘আমি ভালো আছি’ কথাই বিশেষ শ্রোতার মধ্যে হিংসার উদ্রেক করতে পারে এবং করেও। এই সামান্য কথার রেশ ধরে একটি মানুষের সপ্তাহ কেটে যেতে পারে এই ভেবে যে, ‘উনি ভালো আছেন-আদিখ্যেতা। শুধু আমাকে শোনানোর জন্যে বলা। ভালো আছে না ছাই। কেমন ভালো আছে আমি সব জানি। গা জ্বলে যায় শুনলে।’

এগুলো, আমি হেরে যাচ্ছি এমন একটা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে। অন্যের সুখ হিংসা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সব জায়গাতেই আমি পরাজিত হচ্ছি এমন একটা চিন্তা কাজ করে। হিংসা এমন একটা মানসিক বিকার যা ঈর্ষার চেয়েও বেশী উত্তেজনাকর। হিংসা শুধু অন্যের ভালো দেখে মন খারাপ করে বসে থাকে না। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সেই প্রস্তুতি শূন্য থেকে মারাত্মক ক্ষতি পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

সেই ক্ষতি নিজে করুক বা অন্যকে দিয়ে করাক, ক্ষতি করার একটা কুপ্রবৃত্তি

অনবরত মনকে তাড়িত করে চলে। অন্যের ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত, অথবা অন্যের ক্ষতির সংবাদ না আসা পর্যন্ত হিংসা মনকে অস্থির করে রাখে। হিংসা অবদমিত হয় যতক্ষণ না অন্যের একটি খারাপ সংবাদ কানে না আসে বা চাক্ষুষ না হয়। অর্থাৎ হিংসার পরিণতি হচ্ছে অন্যের ক্ষতিসাধন। এক অদ্ভুত মানবিক বিকার যে অন্যের ক্ষতিসাধনে তৃপ্তি বয়ে আনে। যা অন্যের দুঃসংবাদে মনকে খুশি করে তোলে।

আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে হিংসা শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী গরিব যে কোন কারোর মধ্যেই বাসা বাঁধতে পারে এমনকি ভয়াবহ রূপও নিতে পারে। হিংসায় ছোটো খাটো অপরাধ থেকে মারাত্মক অপরাধ পর্যন্ত সংগঠিত হতে পারে। খুন খারাবি, অগ্নি সংযোগ, লুঠ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত বিদ্বেষ সবকিছুর মূলে হিংসা কাজ করে। হিংসা কারো মনে আপনা আপনিই জন্ম নিতে পারে, আবার অনেক সময়ে অন্যের উসকানিতেও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যৌন লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধু মাত্র প্রতিহিংসা থেকেই ধর্ষণ সংগঠিত হয়েছে এবং সে সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবারের অল্প বয়স্ক মেয়েরাই হিংসার শিকার হয়ে ধর্ষিতা হয়।

এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর এক ব্যক্তির প্রচণ্ড হিংসা, সে কারণে তার মনে জন্ম নেয় প্রতিশোধস্পৃহা। একটিই কথা- ওর ক্ষতি চাই। যে করেই হোক ক্ষতি করতে হবে। অপর পক্ষের অল্প বয়স্ক মেয়েকে অপহরণ করে গনধর্ষণ করে হত্যা করে হিংসা চরিতার্থ করার ঘটনাও বিরল নয়।

পৃথিবীর যত বড় ক্ষতি সাধন হয়েছে তার বেশীর ভাগের মূলেই রয়েছে হিংসা। এটা বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও দেখা যায়।

হিংসা জন্ম নিয়েছে মনে। কি আশ্চর্য, ইচ্ছে করলেই, একটু সতর্ক থাকলেই হিংসা পরিত্যাগ করা যেত। নিজের সঙ্গে বিশ্লেষণে বসলেই নিজেকে শান্ত করা যেত আর পৃথিবীর অনেক অকল্যাণ রোধ করা যেত। মানুষের মস্তিষ্কের একটি ছোট্ট স্নায়ু কোষে জন্ম নেয় হিংসা আর তা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে সারা বিশ্বে।

হিংসাকে শুরুতেই আটকে দিতে না পারলে এটা বাড়তেই থাকে বারুদস্তুপের বিস্ফোরণের মত। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বিস্ফোরণের তাণ্ডব। উন্মত্ত হয়ে ওঠে মানুষ আর পরিবেশ। তখন বাইরের অনেক উপাদান যোগ দেয় আর বাড়তে থাকে হিংসার ব্যাপ্তি ও পরিধি। আগুনে বর্ষিত হয় ঘি আর বাতাস।

মানুষের পৃথিবী ধ্বংস হবে মানুষেরই হাতে যদি হিংসাকে এরা নিয়ন্ত্রন না করতে পারে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বড় প্রয়োজন আজকের পৃথিবীতে। শুভবুদ্ধি যাদের আছে তারাই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন। তারাই ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন। পরিশেষে হিংসা থেকে মুক্তির জন্যে গীতার একটি শ্লোকের আশ্রয় নিতে হচ্ছে—

শ্রীমদ্ভগবত গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,

আত্মৌপম্যেন সর্বত্রং সমং পশ্যতি যোঞ্চর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যে নিজের সাদৃশ্য অনুসারে সবকিছুকে সমভাবে দেখে এবং যে সুখ ও দুঃখকে সমভাবে দেখে সেই পরমশ্রেষ্ঠ। আমাদের এই মানবজাতিকে রক্ষার জন্য এমন উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তা সম্পন্ন মানুষ চাই যিনি সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন।

এঁরাই মানুষকে বাঁচাতে পারেন, এঁরাই পৃথিবীকে রক্ষাকরতে পারেন।

Jealous
I'm jealous of the rain
That falls upon your skin
It's closer than my hands have been
I'm jealous of the rain
I'm jealous of the wind
That ripples through your clothes
It's closer than your shadow
Oh, I'm jealous of the wind
'Cause I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There's nothing to forgive
But I always thought you'd come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It's hard for me to say, I'm jealous of the way
You're happy without me
I'm jealous of the nights
That I don't spend with you
I'm wondering who you lay next to
Oh, I'm jealous of the nights
I'm jealous of the love
Love that was in here
Gone for someone else to share
Oh, I'm jealous of the love
'Cause I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There's nothing to forgive

But I always thought you'd come back, tell me all you found was

Heartbreak and misery
It's hard for me to say, I'm jealous of the way
You're happy without me
As I sink in the sand
Watch you slip through my hands
Oh, as I die here another day, yeah
'Cause all I do is cry behind this smile
I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There's nothing to forgive

But I always thought you'd come back, tell me all you found was

Heartbreak and misery
It's hard for me to say, I'm jealous of the way
You're happy without me
It's hard for me to say, I'm jealous of the way
You're happy without me
Source: LyricFind

Songwriters: Josh Kear / Natalie Hemby / Timothy Mckenzie

Jealous: It is a feeling or showing an envious resentment of someone or their achievements, possessions, or perceived advantages.

Or otherwise it may be described as a feeling or showing a resentful suspicion that one's partner is attracted to or involved with someone else.

If you are jealous of someone, you want what they've got. This is one of the most basic human emotions, and it is not pretty. Don't be jealous of my good looks: you're cute too. Sometimes it is told that - suspicious or unduly suspicious or fearful of being displaced by a rival is jealous.

Being jealous is among the least attractive things you can be. The word jealous is actually derived from a Middle English word related to zealous, which means emotionally intense. It conveys a sense of emotional pain at someone else's good fortune. Jealousy is a close cousin of envy, but it can also mean "fiercely guarding" - as in "I am jealous of the little money I've managed to make, so I'm not likely to blow it on a cheap toy." Jealous is showing extreme cupidity; painfully desirous of another's advantages.

ক্রোধ
(Anger)

ক্রোধ এমনই একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ আবেগ যা মানবজাতির সৃষ্টির সময় থেকেই এই পৃথিবীর প্রভূত ক্ষতি করে চলেছে। অন্য অনেকগুলি আবেগ ও তাদের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের কারণে ও তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ে ক্রোধের ক্রীতদাস।

ক্রোধ মনের এমনই এক বিকার যা শুধু নিজের অপকারই করে না এবং একই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সকলেরই ক্ষতি করে। এটা অনেকেই বোঝে না যে, যে মুহূর্তে মানুষ রেগে গেল সেই মুহূর্ত থেকেই সে হারতে শুরু করল। জীবন মানে প্রতিযোগিতা। বেঁচে থাকার জন্যেই সে প্রতিযোগিতা। জীবন প্রতিদিনের চড়াই উতরাইয়ের মাঝ দিয়েই প্রতিদিনের প্রতিযোগী সে। আর সে প্রতিযোগিতা তার নিজের সঙ্গে, নিজের গতদিনের অবস্থানের সঙ্গে, গতকালের 'আমি'র সঙ্গে আজকের 'আমি'র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা ভালো কিন্তু সেখানে ক্রোধের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার সুস্থ উপস্থিতিকে সুস্থির থাকতে দেয় না।

দেখা গেছে পৃথিবীর অনেক পণ্ডিত ও প্রতিভাবান শুধু ক্রোধের কারণে জীবনটা জলাঞ্জলি দিয়েছেন। অনেক সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন। তারা যে অনেক ভালো কাজ করেছিলেন তা মানুষ ভুলে গেছে। ক্রোধের কারণে তারা যেটুকু খারাপ করেছেন সেটাই মানুষ বলে চলেছে। মানুষের মনে শুধু ঘৃণাই রেখে যান তারা। আবার শুধুমাত্র ক্রোধ সম্বরণ করার ফলে অতি সাধারণ মানুষ কত অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। দেশবরেণ্য হয়ে উঠেছেন। মানুষের মনে স্থায়ী আসন পেতে রেখে গেছেন ক্রোধ বর্জিত জীবনযাপনের জন্য।

ক্রোধ হচ্ছে অসুখী, বিরক্তি, শত্রুতা, প্রতিকূলতা, প্রতিযোগিতার, আক্রোশের ও বিরোধিতার প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ। এটি আবেগের চরমতম অবস্থা। ক্রোধ হচ্ছে আক্রমণের এক অস্বস্তিকর পূর্বাবস্থা, বলা যায় ঝড়ের পূর্বের ঈশানকোনে কালবৈশাখী মেঘ। ক্রোধকে বলা হয় বিদ্বেষের চরমতম মানসিক অবস্থান। মানুষ সবসময়েই নিজের জীবনের ব্যর্থতার অংক কষে, কি পেলাম না, কত পেলাম না। খুব কম মানুষ আছে যারা কি পেলাম আর কত পেলাম তার হিসাব কষে। আর

এই 'পেলাম না' বিষয়টার জন্য সে নিজের কোন দোষ দেখতে পায় না। সর্বদাই সেভাবে অন্যের কারণে তার এই 'পেলাম না', অন্য কেউ দায়ী। অন্য কেউ তার জীবনের পূর্ণতা পেতে দিল না। এখানেই জন্ম ক্রোধের। অথচ বিশ্ববরেণ্য মনীষীরা বলেই গেছেন, 'মানুষের অনেক ব্যর্থতা। কোন মানুষ আজও পূর্ণতা অর্জন করেনি। একশো ভাগ পূর্ণতা বলে কিছু নেই।

অত্যাচার, ভয় ও অকল্যাণে পৃথিবীতে মানুষ পূর্ণতা পাচ্ছে না। একদিন এই মানুষই মানবতা প্রতিষ্ঠা করবে।' মনীষীদের কথা' মানুষ শুনতে পাচ্ছে? তারা শুধুই ক্রোধেই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জীবন এক প্রতিনিয়ত রিলেরেস। সকলেই অপেক্ষমান। সকলকেই দৌড় শুরু করতে হবে পূর্বসূরির হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে। আবার একটা নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আর ব্যাটন হাতে রাখা যাবে না। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দিতে হবে। আর এই জীবন যুদ্ধে জিততেই হবে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে, একটুও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না। টিকে থাকতে হলে জিততে হবে এ যুদ্ধে। জীবন যুদ্ধে জেতার অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরাজিত করা, অন্যকে হারিয়ে দেওয়া। জীবন যুদ্ধে জয়ের অর্থই হচ্ছে ভালো কিছু করা - মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, পৃথিবীর জন্য ভালো কিছু করে যাওয়া। আমাদের সকলের দায়িত্ব একটাই তা হচ্ছে ভালো কিছু রেখে যাওয়া পৃথিবীর জন্যে, ভবিষ্যৎ শিশুর জন্য।

আর ভালো করতে গেলেই চাই ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা। ক্রোধ এমনই এক ঘরশত্রু যা নিজেকে শেষ করে দেয়,যা মুহূর্তের মধ্যেই সব ওলটপালট করে দিতে পারে। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ফ্রান্সের ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন জিনেদিন জিদানের কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা। আমি রাত জেগে খেলাটির সরাসরি সম্প্রচার দেখেছিলাম টেলিভিশনে। ফাইনালে খেলছিল ইতালি আর ফ্রান্স। মার্কো মাতারেজ্জি খেলা চলাকালীন মাঝমাঠে রাগানোর জন্যই জিদানকে বারে বারে কটু কথা বলেছিল। রাগের মাথায় ইটালি দলের অধিনায়ক মার্কো মাতারেজ্জিকে ঢুসো মেরে বসলেন জিদান, ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি জিদান। মাতারেজ্জি মাটিতে পড়ে গেল। রেফারি হোরাসিও এলিজন্ডো ফুটে এলেন দুজনের মাঝখানে। রেফারি হোরাসিও এলিজন্ডো জিদানকে লাল কার্ডদেখাতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। তিনি জিনেদিন জিদানকে মাঠ থেকে বের করে দেন তৎক্ষণাৎ।

টেলিভিশনের পর্দায় আমরা যারা খেলাটি দেখছিলাম আমরা সকলেই জিদানের ভক্ত ছিলাম। শুধু জিদানের জন্যেই আমরা সকলে মনে মনে চাইছিলাম ফ্রান্স এবার বিশ্বকাপ জিতুক। বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্স জিতুক তা চাইছিলাম শুধু এ জন্যই যে জিদান জিতুক। ফ্রান্স সেবার জিততে পারেনি। জিদান মাঠের বাইরে

বেরিয়ে যাওয়াতে মনোবল ভেঙ্গে যায় ফ্রান্স দলের। শ্বাসরুদ্ধকর পেনাল্টি শটে ৫-৩ গোলে হার স্বীকার করে ফ্রান্স। বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত ও দর্শককে হতাশ করল।

বিশ্বের সেরা ফুটবলার ক্রোধের কারণে শুধু একটি জাতির আশা ভরসা শেষ করলেন তাই নয়, সারা বিশ্বের অগণিত ভক্তকে হতাশ করেছিলেন আর কলঙ্কিত করেছিলেন ফুটবলকে। অথচ জিদান যদি সেদিন তার ক্রোধ সংবরণ করতে পারতেন তবে তিনি পেলে, মারাদোনা বা রোনাল্ডোর মত কালজয়ী নায়ক হয়ে থাকতে পারতেন। অন্য রকম লেখা হত ইতিহাস।

ক্রোধ মানুষের প্রথম আদিম উশৃঙ্খল আবেগের জঘন্যতম একটি আবেগ। প্রেম মানুষের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর একটি আবেগ। ক্রোধাক্রান্ত মানুষের মনে প্রেম থাকে না। থাকে পশুত্ব। পশুদের রাগটিই প্রধান স্বভাব। পশু প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই থাকে সুপ্ত অবস্থায়। কেউ এই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আবার কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মানুষের মধ্যে এই পশু প্রবৃত্তি যখনই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই ঘটে বিপত্তি। রাগলে মানুষ পশু হয়ে যায়। রাগলে মানুষ আর পশুতে কোনই পার্থক্য থাকে না। বরং বলা যায় ক্রোধান্বিত মানুষ ক্ষিপ্ত পশুর চেয়েও বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে, বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বর্বর হয়ে ওঠে মানুষ।

রেগে গেলেই মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলে। একটা পাশবিক শক্তি তাকে কব্জা করে ফেলে। হিংস্র আচরণ করতে শুরু করে। মানুষ মানুষকে আক্রমণ করে বসে। মানুষ মানুষকে খুন করে ফেলে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের শিশু বাবা মা কেউই রেহাই পায় না ক্রোধের হাত থেকে। তার হিতাহিতজ্ঞান থাকে না তখন। অনেককে সারাজীবন কারাগারে কাটাতে হয় এ কারণে। পরিবারে নেমে আসে মহাবিপর্যয়। আর একটি কথা-এমন বহু ঘটনা আছে, রাগের মাথায় ভয়ানক কিছু করার পর যখন তার রাগ কমে যায় তাকে দেখা যায় প্রবল অনুশোচনা করতে -কেন আমি করলাম, এটা কি করলাম আমি, যদি আমি এটা না করতাম তবে সকলের মত আমিও সুন্দর জীবন কাটাতে পারতাম। এই আত্মসমালোচনা একটি মানুষকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। বড়োবড়ো নেতাদের বেলাতেও দেখাগিয়েছে শুধুমাত্র বাকসংযমের অভাবেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। তাদের জনপ্রিয়তাও তলানিতে নেমে গিয়েছে।

ক্রোধ মানুষের শরীরে ও মনে, ব্যবহার ও কথাবার্তায় অদ্ভুত পরিবর্তন আনে। তার নিকটজন যেন তাকে চিনতেই পারে না এমন হয়ে যায়। মুখাবয়বে ও শারীরিক ভাষায় অন্যরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারও পাল্টে যায়। এ সময়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে মানুষ ক্রমাগত

ভুল করতে থাকে। কারণ একটাই যে তখন তার মস্তিষ্কের উপর স্বনিয়ন্ত্রণ আর কাজ করে না।

পশুদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কারণ তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কের তেমন কোন বিশেষ নার্ভ সেল বা কোষ নেই। মানুষের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কে বিশেষ কোষ থাকে যারা সব সময়েই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। যে কারণ মানুষ মানুষ থাকে, পশু হয়ে যায় না। সংসারে যেমন একজন কর্তা থাকেন, তিনি সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট থাকেন ঠিক তেমন। ক্রোধ মস্তিষ্কের ওই নিয়ন্ত্রক কোষগুলিকে অকেজো করে দেয়।

ক্রোধের ফলে সকল কাজেই নিজের নিয়ন্ত্রণ কমে যায় এবং যে কোন বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও কমে যায়। সঠিক চিত্র সে দেখতেই পায় না। বুঝতে তো পারেই না উপরন্তু একটা ধোঁয়াশা তাকে ঘিরে ফেলে। তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

আমার পর্যবেক্ষণের চেয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের মতানুসারে ক্রোধের সংজ্ঞা আরও একধাপ এগিয়ে। তাদের ব্যাখ্যা আরও বাস্তব মনে হতে পারে। তাদের একাংশ বলছেন, ক্রোধ সকল মানুষের মৌলিক ও একটি স্বাভাবিক আচরণ।তারা বলেন টিকে থাকার জন্য ক্রোধ মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় আবেগ। তারা বলছেন, পৃথিবীতে সকল জীব আধিপত্যবাদী। একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই নিজের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। না হলে তারা প্রকৃতি থেকে মুছে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

মনিষীদের একাংশ বলছেন, 'ক্রোধ হচ্ছে অন্যের আক্রমণের থেকে মানুষের নিজেকে রক্ষা করার প্রধান অস্ত্র।' সবসময়ই একে অন্যের উপর আধিপত্য খাটিয়ে চলেছে। প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র ক্রোধ। অস্তিত্ব রক্ষার অস্ত্রই ক্রোধ। তারা বলছেন, 'ক্রোধ একটি উপকারী আবেগ। নিজের অস্তিত্ব রক্ষাকারী এক প্রয়োজনীয় অস্ত্র।'

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, 'আমি তো তোদের ফোঁস করতে নিষেধ করিনি।' ফোঁস করাটাও ক্রোধ। শান্তিবাদী রামকৃষ্ণও অস্তিত্ব রক্ষার্থে ফোঁস করতে বলেছেন, তবে সে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রনে রেখে। তিনিও অস্তিত্ব রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন নিজে বাঁচলে তো ধর্ম করবে। নিজে টিকে থাকলে তো কর্ম করবে। অপরদিকে অশান্ত মানুষ অশান্তি নিয়ে ঘুরছে। সকল মানুষ মাথার মধ্যে ক্রোধ নিয়ে ঘুরছে।

সমাজ সকল সময়ে সাম্যের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে না, শান্তির সাগরে ডুবে থাকছে না। সে জন্যই যুগে যুগে মহাপুরুষেরা শান্তির আবেদন করে গেছেন এই অশান্ত পৃথিবীতে। তারা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য নিজের জীবন

উৎসর্গ করেছেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা মনিষীদের জীবনী ঘাঁটলে দেখা যাবে অনেকে সংসার করতে পারেনি। সমাজের কাজ করতে গিয়ে তারা বিয়ে করতেও সময় পাননি।

অনেকে হয়ত বিয়ে করেছেন কিন্তু মানুষের কথা ভাবতে গিয়ে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি, সংসার বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা ভাবতে পড়েননি। মানুষের জন্য পূর্ণ শান্তির পৃথিবী অন্বেষণ করতে গিয়েই নিজের সুখ ও শান্তিকে বিসর্জন দিয়েছেন।

বেশির ভাগ মনিষী সারা পৃথিবীর শান্তির কথা বলতে বলতে তাঁদের জীবনপাত করেছেন। আমি এতক্ষণ এই কথাগুলো বললাম এটাই বলতে যে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি আসেনি কোনদিনই। পৃথিবী অশান্তই রয়ে গেছে যুগে যুগে। অশান্ত থাকার একটিই উপাদান কাজ করেছে, তা হল আধিপত্য। অন্যের আধিপত্য থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার মন্ত্র ক্রোধ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যেদিন তুমি দেখলে তুমি সারাদিন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হওনি, তখন বুঝবে তুমি সারাদিন সঠিক পথে ছিলে না।' তিনিও বলতে চেয়েছেন, জীবন কোন মসৃণ তৃণভূমি নয়, সমস্যাসঙ্কুল এক সংগ্রামক্ষেত্র। সমস্যা থাকবে, সে সমস্যা সমাধান করতে হবে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে, ক্রোধ দিয়ে নয়।

পৃথিবী ক্রোধে উত্তপ্ত- উন্মত্ত। ক্রোধ অনেক সময়েই প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের অস্ত্র। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়েছে। শোষকের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনতা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে। সমন্বিত ক্রোধ একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। দুষ্ট শাসককে উৎখাত করেছে।

এখন ক্রোধের মাত্রা নিয়ে কিছু আলোচনা করব, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে ক্রোধের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগের পরিধি। সুখের যেমন মাত্রা থাকে, দুঃখের তেমন মাত্রা থাকে, ক্রোধেরও মাত্রা থাকে। সীমার মধ্যে থাকলে সুখ বা দুঃখ মানুষের বিড়ম্বনার কারণ হয় না। তেমন ভাবে ক্রোধও মাত্রার মধ্যে থাকলে বিড়ম্বনা হয়না হয়ত। সুখ সীমা অতিক্রম করলে যেমন সুখ দুঃখে পরিণত হয়। দুঃখ অতিরিক্ত হলে যেমন আত্মহননের কারণ হয় তেমনই ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেলে অনিবার্য বিপত্তি ডেকে আনে।

এই নিয়ে প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে বর্তমান সময়ের পণ্ডিতদের মতবাদের সংঘাত রয়েছে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদেরা একথা অবশ্য বলছেন যে অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ব্যক্তিত্বের উপর ও সামাজিক অবস্থানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ক্রোধ সাধারণত তিন প্রকার চিহ্নিত করা হয়ে থাকেঃ

১। হঠাৎ বা আকস্মিক ক্রোধ-এই ধরণের ক্রোধ দ্রুত সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। এই ক্রোধ মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং যে কোন

অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। মানুষ খুব আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তখন। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তি বিনষ্ট, লুঠ পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে।

২। স্বতঃপ্রণোদিত ক্রোধ -অন্য কেউ ক্ষতি করলে বা ক্ষতি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে এই ধরণের পরিকল্পিত ক্রোধ জন্ম নেয়। এ ধরণের ক্রোধ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না।

৩। পরিকল্পিত ক্রোধ- এ ধরণের ক্রোধ সাধারণত ব্যক্তিটির চরিত্রগত বা স্বভাবগত। এরা সকল সবসময়ই খিটখিটে মেজাজের হয়ে থাকে। একটা পরিকল্পিত ক্ষতি করার বাসনা তার ভিতরে কাজ করে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সুচারুরূপে পরিকল্পনা করে অন্যের ক্ষতি করে থাকে। পরিকল্পিত ক্রোধ সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ সাধারণত খুব বড়ো ধরণের ক্ষতি করার জন্যই পরিকল্পিত ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্ষতি করার পর তবেই ক্রোধের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে।

বর্তমান কালের চিন্তাবিদেরা বলছেন এতদিনের ধারণার বিপরীতে একেবারে অন্য একটি কথা-তারা বলছেন ক্রোধ মানুষের স্বভাব বদলে দিতে সাহায্য করে, সামাজিক ব্যবহার ও জনসংযোগের ক্ষেত্রে মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এমনকি অনুতপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ক্রোধ। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। কারণ ক্রোধান্বিত মানুষ ক্রোধ প্রকাশের পরই তার ভিতরে থেকে নিজে নিজেই তার কাজের খারাপ দিকগুলি বিশ্লেষণের তাগিদ অনুভব করে। একটা শান্ত অবস্থা সকল মানুষের মধ্যে দিনের কোন এক সময়ে আসবেই। আর তখন সে বিশ্লেষণে বসে।

কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাকে নিজের নিকট নিজের একটা জবাবদিহির তাগিদ অনুভব করতে হয়। কেউ জবাবদিহি করে আবার কেউ করে না।

ক্রোধ প্রশমিত হলেই সে একটা শান্ত সময়ের মধ্যে থাকতে চায়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত অবস্থায় থাকে। তখন সে নিজেই বিশ্লেষণে বসে যায়। আর ভাবতে শুরু করে কি কি তার করা উচিৎ ছিল আর কি কি না করলে ভালো হত। এই ক্রোধের প্রস্তুতি, ক্রোধের বাস্তবায়ন ও তৎপরবর্তী শান্ত ভাব, এই তিনটি অবস্থা সকল মানুষের মধ্যে আসে। শান্ত ভাবের মধ্যেই মানুষের নিজের কৃতকর্মের বিশ্লেষণ ও সংশোধনের ব্যাপারটি ঘটে। অপরদিকে ক্রোধ ভয়ানক ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে যদি লোকটি তার সঠিক জানালা খুঁজে না পায় যেখানে সে প্রকাশ করবে। ক্রোধ তখন তার তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা হারায়, নিজের ব্যবহারের খারাপ দিকটি দেখার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। তার দূরদর্শিতা, চিন্তাশক্তি, বিচক্ষণতা ও অপরের প্রতি সহানুভূতির জায়গাটুকু হারিয়ে ফেলে।

ক্রোধ ও আগ্রাসী মনোভাবের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, এই দুটি একে অপরকে প্রভাবিত করে। ক্রোধ আগ্রাসী মন তৈরি করতে এগিয়ে আসে এবং

তখন ক্রোধের সহায়তা নিয়েই আগ্রাসী মন অন্যের ক্ষতি করতে উদ্যত হয় অনেক সময়ে, 'ফিরিবার পথ নাহি' পর্যায়ে চলে যায়। আর এই অবস্থা থেকে বিরত করার জন্য কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হয়। অথবা আইনের বেড়াজালে আটকে তাকে সংশোধনাগারেও যেতে হতে পারে।

ক্রোধ হচ্ছে আক্রমণের জন্য একটি উত্তেজনা। জীবনের শুরুতে শিশু অবস্থায় দেখা যায় কোন কিছুতে তার গতি বা ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হলেই তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শিশু বেড়ে ওঠে আর বুঝতে শেখে কান্না, ছুড়ে ফেলা বা আঘাত করা- এই গুলোর উপকারিতা।

এও বুঝতে শেখে যে এগুলো কোনও ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করতে হবে, কোন বস্তুর উপর নয়। শৈশব থেকেই বুঝতে শেখে ক্রোধ প্রকাশের উপকারিতা। মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয় আর ধীরে ধীরে শিশুসুলভ চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, কিন্তু সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে ক্রোধ। অন্যকে শারীরিক আঘাত করা থেকে নিবৃত রাখে নিজেকে অনেক সময়। এই শারীরিক আঘাত বা আক্রমণের অভ্যাস পরিবর্তিত হয় ক্রোধে-একটি মানসিক আচারে।

আমার এই গ্রন্থখানি লেখা শুধুমাত্র একটি রিপোর্ট তৈরির জন্য নয়। কিছু মানুষের বোধে আনার জন্যে কিছু কথা বলা প্রয়োজনেও - ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে সকলকে, অন্তত নিজের ও পারিপার্শ্বিক মানুষের মঙ্গলের জন্য। ক্রোধ কমানোর জন্য নিজের মধ্যে একটা সদাপ্রস্তুতি মনোভাব রাখতে হবে। তেমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করতে হবে।

অবশ্য তার আগে নিজের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা ক্রোধ সম্বন্ধে নিজেই একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। নিজের সাথে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হবে। ক্রোধ সকল যুক্তিবোধকে বিনষ্ট করে। বিচারবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। আত্মসমালোচনার জায়গায় থাকে না। ভাষাও শারীরিক প্রতিক্রিয়া, দুটোতেই সংযত হতে হবে। রাগ নিয়ন্ত্রণ একটা সাধনা, একটা কঠিন তপস্যা। যোগব্যায়ামে বেশ কিছুটা কাজ হয়। আত্মসমালোচনা অনেক সময়েই নিজের কৃতকর্মকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ করে দেয়। পরবর্তীতে অনেক অঘটন থেকে মুক্ত থাকা যায়।

অনেক মানুষই আছেন যারা আত্মসমালোচনা করার মত ক্ষমতা বা সাহস রাখেন, তারাই পৃথিবীকে সহজ করে রেখেছেন।

আত্মসমালোচনায় প্রচণ্ড সাহস প্রয়োজন। আত্মসমালোচনা টনিকের মত, এত প্রশান্তি আর কিছুই দেয় না। আত্মসমালোচনা কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। নিজেকে নিরাপত্তা দেয় কোন দেহরক্ষী ছাড়াই। কারণ রাগের সঙ্গে দেহরক্ষীও পেরে ওঠে না, হার স্বীকার করে নেয়। বাঁচাতে পারে না কর্তাকেও।

আত্মসমালোচনা মানুষের ভবিষ্যৎ চলার পথ সুগম করে দেয়। ক্রোধ যিনি

দমন করতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। শুধু এই একটি গুন মানুষকে কত উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে সকলেরই একটুখানি ভেবে দেখা উচিৎ। ক্রোধ সম্বরণের উপায় বাতলানোর জন্য আমার নিকট অনেক মানুষ এসেছেন। স্ত্রী এসেছেন তার স্বামীর জন্যে, জিজ্ঞাসা করছেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীর রাগ কমানোর ওষুধ আছে?' অনেক স্বামী এসেছেন তার স্ত্রীর জন্যে। বলেছেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রীর খুব রাগ। ওর রাগ কমানোর ওষুধ আছে?'

আমি সকলকেই একটি উপায় বাতলেছি। খুবই সহজ অথচ খুবই উপকারী , তাদের বলেছি, 'ক্রোধ কমানো - এটা একটা ব্যায়াম। কাউন্সেলিং প্রয়োজন।' ওই মহিলার স্বামীর সঙ্গে বসেছি খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবে। খুব ধীরে শুরু করেছি আলোচনা। স্বামীকে বুঝতে দেইনি যে এটা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে তিনি ক্রোধ এড়িয়ে চললে তার ও সংসারে সকলেরই সুস্থিতি। তাকে একটি ব্যায়াম শিখিয়ে দিলাম।

এক সপ্তাহ পর তিনি এসে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আমি এমন করে ভাবিনি বিষয়টা। সত্যিই তো আমি আমার রাগ নিয়ন্ত্রন করলে আমার ও সকলেরই মঙ্গল। আমি আজ দুইদিন মানসিকভাবে সত্যিই ভালো বোধ করছি। হালকা বোধ করছি। আমার স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলে আমার কাছে এসে বসেছে।'

প্রতিদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগেই চোখ বুজে মাত্র দশ সেকেন্ড এক জায়গায় শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলা, 'আজ কোনও রাগ নয়, ক্রোধ নয়। অনেক মানুষ আজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিছু ভালো কথা শোনার জন্য। যত কিছুই সামনে আসুক আজ আমি কোনমতেই রাগব না।'

রাতে শোবার আগেও নিজের সাথে বলা, 'আজ আমি ক্রুদ্ধ হয়ে মোটেই ভালো করিনি। আগামিকাল কোন রাগ নয় কারো সাথে, কোন সময়েই নয়।' এর সুফল অনেকেই পেয়েছেন।

Anger is a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility.The emotion, anger, also known as wrath or rage, is an intense emotional state. It involves a strong uncomfortable and hostile response to a perceived provocation, hurt or threat.

A person experiencing anger will often experience physical conditions, such as increased heart rate, elevated blood pressure,and increased levels of adrenaline and noradrenaline. Some view anger as an emotion which triggers part of the fight or flight brain response. Anger becomes the predominant feeling behaviourally, cognitively, and physiologically when a person makes the conscious choice to take action to immediately stop the threatening behaviour of another outside force.

The English term 'Anger' originally comes from the term anger of Old Norse language. Old Norse was a North Germanic language that was spoken by inhabitants of Scandinavia and their overseas settlements from about the 9th to the 13th centuries.

Anger can have many physical and mental consequences. The external expression of anger can be found in facial expressions, body language, physiological responses, and at times public acts of aggression.

Facial expressions can range from inward angling of the eyebrows to a full frown. While most of those who experience anger explain its arousal as a result of what has happened to them, psychologists point out that an angry person can very well be mistaken because anger causes a loss in self-monitoring capacity and objective observability.

Modern psychologists view anger as a primary, natural, and mature emotion experienced by virtually all humans at times, and as something that has functional value for survival. Uncontrolled anger can, however, negatively affect personal or social well-being and impact negatively on those around them. While many philosophers and writers have warned against the spontaneous and uncontrolled fits of anger, there has been disagreement over the intrinsic value of anger. The issue of dealing with anger has been written about since the times of the earliest philosophers, but modern psychologists, in contrast to earlier writers, have also pointed out the possible harmful effects of suppressing anger.

Three types of anger are recognized by psychologists:

1. Hasty and sudden anger is connected to the impulse for self-preservation. It is shared by human and other animals, and it occurs when the animal is tormented or trapped. This form of anger is episodic.
2. Settled and deliberate anger is a reaction to perceived deliberate harm or unfair treatment by others. This form of anger is episodic.
3. Dispositional anger is related more to character traits than to instincts or cognitions. Irritability, sullenness, and churlishness are examples of the last form of anger.

Anger can potentially mobilise psychological resources and boost determination toward correction of wrong behaviours, promotion of social justice, communication of negative sentiment, and redress of

grievances. It can also facilitate patience. In contrast, anger can be destructive when it does not find its appropriate outlet in expression. Anger, in its strong form, impairs one's ability to process information and to exert cognitive control over their behaviour. An angry person may lose his/her objectivity, empathy, prudence or thoughtfulness and may cause harm to themselves or others. There is a sharp distinction between anger and aggression(verbal or physical, direct or indirect) even though they mutually influence each other. While anger can activate aggression or increase its probability or intensity, it is neither a necessary nor a sufficient condition for aggression.

Anger is the extension of the stimuli of the fighting reactions. At the beginning of life the human infant struggles indiscriminately against any restraining force, whether it be another human being or a blanket which confines his movements. There is no inherited susceptibility to social stimuli, as distinct from other stimulation, in anger. At a later date the child learns that certain actions, such as striking, scolding, and screaming, are effective toward persons, but not toward things. In adults, although the infantile response is still sometimes seen, the fighting reaction becomes fairly well limited to stimuli whose hurting or restraining influence can be thrown off by physical violence.

Anger can be a particularly powerful emotion characterized by feelings of hostility, agitation, frustration, and antagonism towards others. Like fear, anger can play a part in your body's fight or flight response. When a threat generates feelings of anger, you may be inclined to fend off the danger and protect yourself.

Anger is often displayed through:

- Facial expressions such as frowning or glaring
- Body language such as taking a strong stance or turning away from someone
- Tone of voice such as speaking gruffly or yelling
- Physiological responses such as sweating or turning red
- Aggressive behaviours such as hitting, kicking, or throwing objects

While anger is often thought of as a negative emotion, it can sometimes be a good thing. It can be constructive in helping clarify your needs in a relationship, and it can also motivate you to take action and find solutions to things that are bothering you.

Anger can become a problem, however, when it is excessive or

expressed in ways that are unhealthy, dangerous, or harmful to others. Uncontrolled anger can quickly turn to aggression, abuse, or violence.

This type of emotion can have both mental and physical consequences. Unchecked anger can make it difficult to make rational decisions and can even have an impact on your physical health.Anger has been linked to coronary heart diseases and diabetes. It has also been linked to behaviours that pose health risks such as aggressive driving, alcohol consumption, and smoking.

আকাঙ্ক্ষা
(Desire)

এই মুহূর্তে যা পাওয়া যাচ্ছে না, আমার যা নেই, সেটা পাওয়ার জন্য একটা বাসনা তৈরি হয় মানুষের মনে। না পাওয়া বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহই আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। শুধু বস্তু বা বিষয় নয়, দৃশ্যমান বস্তু ছাড়াও অনুভূতি, ভালোবাসা বা প্রশংসা পাওয়ার জন্যেও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। আকাঙ্ক্ষা কোন মনের অস্থিরতা হতে পারে কিন্তু এটা কোন অস্বাভাবিকতা নয়। আশা বা আকাঙ্ক্ষা মনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটা মনের মধ্যে এক ধরনের সঞ্জীবনীর মত। জীবনকে গতিময় করে।

আশা আকাঙ্খা মানুষকে প্রফুল্ল রাখে। বলা যায় বাঁচিয়ে রাখে। প্রতিদিনই মানুষের ঘুম ভাঙে আশা বুকে নিয়ে। চাওয়া পাওয়াই জীবন। নিঃস্বার্থ শব্দটি সবসময় অর্থবহ নয়। শর্তহীন জীবন হতে পারে না। স্বার্থহীন জীবন হতে পারে না। আমার মতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই একটি আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। আশা বা আকাঙ্ক্ষা না থাকলে মানুষের পদক্ষেপ হয়ে যায় এলোমেলো।

আমি সযত্নেই স্বার্থ শব্দটি মঙ্গলময় রূপে ব্যবহার করতে চাই। স্বার্থ আছে, স্বার্থ থাকবে এটাকে ধরে নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় জীবনকে একটু অন্য ভাবে। স্বার্থ যেন ক্ষুদ্রস্বার্থ না হয়। স্বার্থ যেন অকল্যাণকর না হয়। স্বার্থ যেন মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে নিবেদিত হয় সেটা অবশ্য বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

টমাস হবস বলেছেন, আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সকল মানুষের কর্মক্ষমতার মূল ও আদি রসায়ন। আকাঙ্ক্ষাকে কেউ আবেগ বলে বিপথে চালিত করতে সচেষ্ট হন। মনোবিদরা আবেগ ও আকাঙ্খার মধ্যে মোটা দাগের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। তারা বলেন আকাঙ্ক্ষা দেহজ উপকরণ থেকে উদ্ভুত আর আবেগ সম্পূর্ণ মনোজ। যেমনঃ পেট খালি থাকলে ক্ষুধার উদ্রেক হবে। ক্ষুধা একটি আকাঙ্ক্ষা। আর আবেগ দেহ বহির্ভূত হয়ে মনের আঙিনায় জন্ম নেওয়া কাব্যিক তাড়না। নানা রকমের রসালো খাবার খাওয়ার ইচ্ছে আমাদের আবেগ। যেমন দেহজ ও দেহ বহির্ভূত দুই রসায়ন একত্রিত হয়ে তৈরি হয় যৌন আকাঙ্ক্ষা। মানুষের দেহে যে বিভিন্ন প্রকার সেক্স হরমোন আছে তার বিক্রিয়া সরাসরি ক্রিয়াশীল হয় যৌনাঙ্গে

এবং মস্তিষ্কে। কোন যৌন উদ্দীপক দৃশ্য বা গ্রন্থ বা দুইজন পুরুষ মহিলার যৌন কথোপকথন বা চিন্তা বা কল্পনা দেহ বহির্ভূত যৌন আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। এই দুই আকাঙ্ক্ষা (দেহজ ও দেহ বহির্ভূত) যদি মিলিত হয় তবে যৌনক্রিয়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে যা অনেক সময় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এই অপ্রতিরোধ্য যৌন আকাঙ্ক্ষার কারণে কেউ স্বমেহনে অথবা শারীরিক মিলনে প্রবৃত্ত হয়। কারো মধ্যে ধর্ষকাম আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ইদানীং কালে একটা বিরাট সংখ্যক অপরিচিত নরনারী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। একপ্রকার যৌন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় এদের মধ্যে অবাধ আন্তরিক আলোচনার সুযোগে। এরা বেশির ভাগ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

অনেকে ভার্চুয়াল সম্ভোগে বা সহবাসে আনন্দ উপভোগ করছে। সময়ের সাথে এভাবে মানুষের আকাঙ্ক্ষা চরিত্র পরিবর্তন করে চলেছে। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি পর্যায় থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সামান্য মনোজ স্বমেহন থেকে ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী বিকৃতকাম খুন পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে।

আকাঙ্ক্ষা সম্প্রসারণশীল- আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধিষ্ণু। আকাঙ্ক্ষা দিক পরিবর্তন করে। আজ যা পাওয়ার জন্য মনে আকুতি সৃষ্টি করল, যা পেলে তৃপ্তি, সে আকাঙ্ক্ষা যখনই পূরণ হল তখনই সেই আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হল না, তখনই আকাঙ্ক্ষাটি শেষ হল না। বরং তখন সেই আকাঙ্ক্ষার একটি নবজন্ম হল নতুন কলেবরে, রূপান্তর হল নতুন আঙ্গিকে। সেই পুরোনো আকাঙ্ক্ষাই গুনগত ও পরিমাণগত অন্য আকার ধারণ করল।

আরও চাই, আরও চাই বলে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। আরও চাই আরও চাই বলে বেগবান হল নতুন করে ভিন্ন দিকে -অধিক কিছু পাওয়ার আশা আর আকাঙ্ক্ষায়। এই যে আকাঙ্খার স্থান বদল, আকাঙ্খার ভোল বদল এটা কিন্তু অপরাধের তালিকায় ফেললে হবে না। আকাঙ্ক্ষা আর অপরাধের মধ্যে অবশ্যই একটা মোটা দাগের সীমারেখা টানতে হবে। আকাঙ্ক্ষাই জীবন। অপরাধ টেনে নেবে ধ্বংসে। এভাবেই জীবনের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়ে থাকে। আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। অপরাধ ক্ষয় করে, ধ্বংস করে। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আলো দেখায়। অপরাধ মানুষকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা প্রদীপের আলোর মত। যেমন একটি নিজের আলো এতটুকু ক্ষয় না করেও একটি প্রদীপের আলো অনেক প্রদীপে আলো জ্বালায় তেমনি একজনের আকাঙ্ক্ষা আশেপাশের অন্যান্য মানুষকেও প্রভাবিত করে। আকাঙ্ক্ষা যেমন নিজের কর্মোদ্যম সৃষ্টি করে তেমনি পাশের মানুষের মনেও উদ্দীপনা এনে দেয়। আকাঙ্ক্ষা অনেক দুর্বল মনে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে পারে নিজের প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে।

একের আকাঙ্ক্ষা অন্য হতাশপ্রাণ উজ্জীবিত করতে পারে। আকাঙ্খাবান মানুষেরা সবসময়ই উদ্যমে থাকে। উৎফুল্ল থাকে। তার এই উৎফুল্লতা অন্য মনে সজীবতার সৃষ্টি করে। তাই দেখা গিয়েছে একজন উদ্যমী মানুষ অনেক হতাশ মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারে, প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিতে পারে হতাশ মনে।

এক একজন নেতা এভাবে দেশের হতাশ মানুষদের দিয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাদের মনে আশার আগুন জ্বালিয়েছেন আর তারাই বাধার প্রাচীর ভেঙেছেন। অনেক বিশ্ববরেণ্য নেতা যেমন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধী যেমন ভারতবর্ষের নির্যাতিত মানুষদের জাগিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। মাও জে দং দাসত্ব থেকে চিনের মানুষের মুক্তি এনে দেন। লেনিন রাশিয়ার জনগণকে মুক্তির স্বাদ এনে দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন ও একটি সংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের কারাগারে থেকে। এ সকল সম্ভব হয়েছে দুর্বল হতাশ মানুষদের ঘুমন্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলে।

অনেক সময় সব মানুষ নিজের আশা বা আকাঙ্খার হদিস জানে না। নিজের চাহিদা বুঝে ওঠে না। সে যে আরও কিছু পাওয়ার অধিকারি সে তা ঠাহর করতে পারে না। তখন সে নির্জীবের মত ব্যবহার করে। কাউকে না কাউকে জাগিয়ে তুলতেই হয়। প্রতিটি মানুষের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।

আমি অনেকের সঙ্গেই কথা বলে জেনেছি যে তারা ভেবেছেন বিষয়টি। একবার বাবা মা দুজনে তাদের মেয়ে সুতপাকে নিয়ে এসেছিলেন আমার চেম্বারে মেয়েটির আর মাত্র এক সপ্তাহ পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাবা মা দুজনেই আমাকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, সুতপা পড়তে পারছে না। শুধু বমি পাচ্ছে । কিছুই খাচ্ছে না। আর শুয়ে থাকছে। ক'দিন পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এমন হলে পরীক্ষা দেবে কি করে? যে করে হোক ওকে সুস্থ করে দিন, ডাক্তারবাবু।'

আমি ভালো করে সুতপাকে পরীক্ষা করলাম। শরীরে কোন খারাপ কিছুই পেলাম না। মেয়েটির নিকট তার পরীক্ষা বিষয়ক কথা জানতে চাইলাম। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমার কিছুই মনে থাকছে না। যা পড়েছি সেগুলোও ভুলে যাচ্ছি। এরমধ্যেই শুরু হয়েছে বমি আর খাবারের অনিচ্ছা। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আমি পরীক্ষা দেব না।'

এটা অনেকের মধ্যেই কাজ করে। পরীক্ষার হতাশা ও ভয়। এই হতাশা থেকেই এ ধরণের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসতেই ভয় পায়। অনেকে পরীক্ষায় বসেই না। এদের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাটাই আসল কাজ।

এখানে অন্য একটা বিপরীতমুখী চাপ কাজ করে। প্রথম থেকেই বাবা মা গৃহশিক্ষক সকলেই ছাত্রের কাছে দাবি করে বসে, 'তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। জীবনে উন্নতি করতে গেলে তোমার পরীক্ষায় খারাপ করা চলবে না।' একদিকে পরীক্ষার চাপ অন্যদিকে অভিভাবকদের চাপ, বাবা মায়ের চাপ।

আমি তাকে বোঝালাম, 'দেখ সুতপা, ক্লাসের সব ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্লরা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সমান সফল হয় না। অনেক মাঝারি ছাত্র ছাত্রী জীবনে অনেক উন্নতি করেছে। এই তিন ঘণ্টার পরীক্ষাই জীবনের সব নয়।'

সুতপার বাবা মাকেও বোঝালাম। তাদের অনেকক্ষণ বোঝালাম, 'জীবনের অনেক ধাপ। তারমধ্যে পরীক্ষা একটি সহজতম ধাপ মাত্র। এ নিয়ে এত ভাবনা করলে বাকি সব ধাপে কি হবে? পরীক্ষা দিতে হবে তাই দাও।'

সুতপার বাবা মাকে আলাদা করে বোঝালাম, 'দেখুন মেয়ের কোন শারীরিক সমস্যা নেই। পরীক্ষা নিয়ে আপনারা একটু সহজ হয়ে যান। সুতপাকে বলুন- যেমন পার তেমন পরীক্ষা দাও। দেখবেন ভয় সরে গেলে ভালো পরীক্ষা দেবে। ভালো রেজাল্টও করবে। না হলে সুতপা পরীক্ষাতেই বসবে না।'

আমি একটা প্লাসিবো ওষুধ লিখে দিলাম বাবা মা আর সুতপার সন্তুষ্টির জন্য। প্লাসিবো হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় এটা এমন কোন ওষুধ যা শরীরে কোন বিক্রিয়া করে না, অথচ রোগী জানবে যে ডাক্তারবাবু আমাকে আমার রোগের জন্য একটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন। এ সকল ক্ষেত্রে উপকার হয়, রোগীর শরীরে ওষুধের ক্রিয়া পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছুই হল না অথচ অনেক রোগী সুস্থ বোধ করে। আমি সুতপাকে বললাম, 'তোমাকে জীবনে অনেক বড়ো এক সফল মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। এ পরীক্ষাই সব নয়। যাও, বাড়ি গিয়ে প্রস্তুতি নাও আর পরীক্ষা দাও। আমাকে রেজাল্ট জানিয়ে যেও।'

সুতপার বাবা মা ও গৃহশিক্ষককে বললাম, 'আপনারা যদি সুতপার উপর চাপ সৃষ্টি করেন তবে ও পরীক্ষাই দিতে পারবে না।'

সুতপার মা বলে ওঠে, 'ডাক্তারবাবু, সুতপা যদি পরীক্ষা দিতে না পারে তাহলে তো ওর জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। যা হয় একটা কিছু করুন।'

আমি বললাম, 'আপনারা ওর সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কোন কথাই আলোচনা করবেন না। ওর সামনে এমন একটা ভাব করবেন যেন এ পরীক্ষা তেমন কিছু নয়। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন পৃথিবীর তাবৎ ছেলে মেয়েই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় না। আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হলে জীবন শেষ হয়ে যায় না।'

সুতপার মা বাবা চেয়েছিলেন সুতপা ডাক্তার হোক। সুতপা হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছিল। এখন সে একটা বড়ো হাসপাতালের এইচ আর ও।

বিরাট সম্মান ও প্রতিপত্তি সেখানে, আর ওর হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কাজের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ভীষণ ভালোবাসে। ওর উপর এখন অনেক দায়িত্ব।

কিছুদিন আগে এসে সুতপা আমাকে প্রণাম করে গেছে। আমি বললাম, 'সুতপা, ভালো চাকরি তো হল। এবার একটা বিয়ে কর।'

সলজ্জ সুতপা বলল, 'না স্যার, আমি বিয়ের কথা ভাবছি না। সামনে এখন কাজ আর ক্যারিয়ার। অনেক দায়িত্ব। 'আমি অবাক হয়ে সুতপার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আশা আর আকাঙ্খা নব প্রজন্মের মধ্যে চিন্তাধারায় কি পরিবর্তন এনেছে !

আমার এই লেখাটি পড়ে যদি একজন মানুষও উপকৃত হন তবে আমার লেখা সার্থক হবে। নিজের ভিতরে ঘুমন্ত আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে অন্য সকল হতাশার কেন্দ্র থেকে। পরিকল্পনা করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা জীবনের যে কোন বয়সেই ঘটতে পারে। জীবনের যে কোন বয়সে বা সময়ে মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং নিজের অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। জীবনের মোড় ঘোরাতে বয়স লাগে না, অর্থ লাগেনা, লাগে ইচ্ছাশক্তি। প্রয়োজন শুধু আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা আর সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা নেওয়া। খুব বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে জীবনে বিরাট স্মরণীয় কিছু ঘটিয়ে গিয়েছেন তা নয়। বরং কোন অর্থ ছিল না, লোকবল ছিল না এমন মানুষ শূন্য থেকে শুরু করে ইতিহাস গড়েছেন এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নজরুল ইসলাম, আম্বেদকর বা আবুল কালামদের জীবন শুরু শূন্য থেকে।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ছেলে বেলা খুবই কষ্টের। মাত্র চৌদ্দো বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাঁর মা অঘোর কামিনীদেবী মারা যান। ছয় ভাই বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিধান চন্দ্র রায় খুবই অর্থকষ্টে বড়ো হন। তাঁর প্রচণ্ড মানসিক আকাঙ্ক্ষা তাকে চিকিৎসা জগতের চুড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। মাত্র ১২০০ টাকা নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড রওনা হন। সেখানে সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে যোগ দেন। সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য ডীনের নিকট আবেদন করেন। তখন এশিয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না উচ্চশিক্ষায়। তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

তিনি দমে যাননি। ত্রিশ বার আবেদন করার পর তিনি সুযোগ পান ২০০৯ সালে এবং পরপর দুই বছরেই এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রবল আকাঙ্খার উপর নির্ভর করেই তিনি এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারি হন। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতরত্ন উপাধি পান। একসময় কষ্টে থাকা এই মানুষটি ইতিহাসের স্রষ্টা। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। মনে আকাঙ্ক্ষা থাকলে মেরুদণ্ড সোজা থাকে। আকাঙ্ক্ষা মানুষের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দেয়। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সত্যবাদী করে তোলে, চরিত্রবান করে তোলে।

পক্ষান্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে লোভের সৃষ্টি করে। লোভ মানুষের সর্বনাশ করে। তাই লোভ ও আকাকাঙ্খার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে। লোভ মানুষকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। আর আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পরোপকারী করে তোলে। লোভ মানুষকে হিংসাশ্রয়ী করে তোলে। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে দৃঢ়চেতা ও সত্যাশ্রয়ী করে। এরা সৎ মানুষের খোঁজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এরা সৎ মানুষদের একত্রিত করে আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর মঙ্গল কিছু করতে সচেষ্ট হয়। এঁরাই এদের আকাঙ্ক্ষায় নির্ভর করে পৃথিবীকে পাল্টানোর পথ দেখায়। এমন দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি। শুধু একটাই ভয় আকাঙ্ক্ষা যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মোড় না নেয়। তাহলেই সর্বনাশ। আকাঙ্ক্ষারও কোন সীমারেখা থাকে না। আকাঙ্ক্ষা অর্জিত হলেই আকাঙ্খা সীমানা বদল করে, খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী ধাঁচে। পেলেই নতুন আগ্রাসন, নতুন জায়গা দখলের মরিয়া প্রয়াস। সেজন্য আকাঙ্ক্ষা সীমা অতিক্রম করলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের জমিন তৈরি করে। আর ঘটতে শুরু করে বিপত্তি, শুরু হয়ে যায় ভয়ানক পরিণতি।

সমস্ত মনুষ্যধর্ম বাদ দিয়ে নররূপী পশু হয়ে যায়। পাশবিক ক্রিয়াকর্মেই আবর্তিত হয় তার নিজের ও আশেপাশের পরিবেশ। শুধু অবাক হয়ে দেখতে হয় কিভাবে একটা মানুষ অমানুষ হয়ে গেল। একই মানুষ কেউ এই পৃথিবীর মঙ্গল করছে আর কেউ করছে অমঙ্গলের পরিকল্পনা। সেটা হয় মানুষের আকাঙ্খার পার্থক্যে।

যতই আমরা বলছি আকাঙ্ক্ষা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মত, যতই বলছি আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিরোধ্য- সর্বক্ষেত্রে তা সঠিক নয়। সব নির্ভর করছে আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণের নিরীক্ষা। মনঃসংযোগ যার যত বেশি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর যার তীক্ষ্ণ নজর, ঘটনাবলির উপর যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তারাই পারে আকাঙ্ক্ষাকে শিকল পরাতে। তারাই পারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে পরিবর্তিত করতে। এদের সংখ্যা কম হলেও এরাই হয়ে ওঠেন নিয়ন্তা-সমাজ বা রাষ্ট্রের।

Desire is a sense of longing or hoping for a person, object, or outcome. The same sense is expressed by emotions such as - craving. When a person desires something or someone, their sense of longing is excited by the enjoyment or the thought of the item or person and they want to take actions to obtain their goal. The motivational aspect of desire has long been noted by philosophers.

Thomas Hobbes (1588-1679) asserted that human desire is the fundamental motivaton of all human action. Desires are often told as emotions by laypersons,

Psychologists describe desires as different from emotions;

psychologists tend to argue that desires arise from bodily structures, such as the stomach's need for food, whereas emotions arise from a person's mental state.

Marketing and advertising companies have used psychological research on how desire is stimulated to find more effective ways to induce consumers into buying a given product or service.

While some advertising attempts to give buyers a sense of lack or wanting, other types of advertising create desire associating the product with desirable attributes, by showing either a celebrity or a model with the product.

অবিশ্বাস
(Unfaith)

অবিশ্বাস আপাত দৃষ্টিতে সরাসরি কোন আবেগ নয়, এটা আবেগ, অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণের যৌগ। এই গ্রন্থে এর উপস্থাপন করলাম এই ভেবে যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার এটাই উপযুক্ত গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থেই এর সঠিক অবস্থান। অবিশ্বাস মানুষের মনে স্থান করে নেয় অনেকগুলো আবেগের পারস্পরিক অবস্থান ও বিক্রিয়ার ফলে। অবিশ্বাস হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। এটা তৈরি হয় একটু ধীরে, মনের মধ্যে প্রশ্ন আর তারই পাল্টা প্রশ্ন সৃষ্টি করে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের।

এমন একটি বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা করব যেটি শুরুতে মনেই হতে পারে বিতর্কিত, মনে হতে পারে একটা বহুদিনের আলোচ্য বহু চর্চিত বিষয় নিয়ে হঠাৎ এ কেমন বিপরীতমুখী কথা। কানে বাজবে কথাগুলো। আমার আশা পুরোটা পড়ার পর পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং বলবেন যে ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’ কথাটা সবসময়ে সঠিক নয়। বরং পাঠক বলবেন, ‘বহু ক্ষেত্রেই বিশ্বাসে বস্তু মিলায় না, অবিশ্বাসেই বস্তু মিলায়। ’

প্রখ্যাতচিন্তাবিদ ও প্রকৌশলী সুকুমার বিশ্বাস প্রথম বিষয়টির অবতারণা করেছিলেন আমাদের মধ্যে এক একান্ত আলোচনায়। তার সঙ্গে মানুষের আবেগ, সমাজ, সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। অবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি কিছু যুক্তিপূর্ণ কথার উপস্থাপন করেন। তিনি এমন কিছু যুক্তি দেখান যার ফলে আমি তার কথা খণ্ডন করতে পারিনি এবং আমিও আমার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসি। তিনি অবিশ্বাসের সারবত্তা সম্বন্ধে আমার ধারণায় গুনগত পরিবর্তন আনেন।

সুকুমার বিশ্বাসের অকাট্য যুক্তি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে। অবিশ্বাসের ধারাবাহিকতাই যে মানুষের চিন্তন ও সমাজ পরিবর্তনের মূল দাবিদার এটা আমার ও সুকুমার বিশ্বাসের আলোচনায় উঠে এসেছে বারবার।

তিনি মাঝে মাঝে আমার চেম্বারে আসেন এবং এ সকল বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে অবসর সময়ে মতবিনিময় করেন। তার সঙ্গে অবিশ্বাস আর বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছি অনেক দিন অনেক সময়। তার ক্ষুরধার যুক্তি আমাকে আলোড়িত

করে। এরপর আমি স্থির করলাম অবিশ্বাস নিয়ে লিখব। আগেই বলেছি অবিশ্বাস কোন আবেগ নয়। এটি একটি যুক্তি ও তর্ক। সুকুমার বিশ্বাসের যুক্তি ও ভাবনার তাড়নায় আমার এই প্রতিবেদন। এটা প্রচলিত ধারনার প্রতিবাদ হিসাবে না ধরে সম্পৃক্ত চিন্তা হিসাবে বিবেচনা করলে বহু বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে। এটা একটা চিন্তার ধারাবাহিকতা মাত্র, অথবা আবেগের ও যুক্তির একটা সংমিশ্রণ বলা চলে। একই সঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণও তুলে ধরেছি। এটাও বলে রাখা ভালো যে কারও কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের উদ্দেশ্যে আমার এ লেখা নয়।

অবিশ্বাসই চালনা করছে আমাদের, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক মন থেকে অন্যমনে, একজন থেকে অন্যজনে, এক যুক্তি থেকে অন্য যুক্তিতে, এক তর্ক থেকে অন্য তর্কে। অবিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছে এক সময় থেকে অন্যসময়ে, কাল থেকে কালান্তরে। অবিশ্বাস যেন এক টাইম মেশিন- চিন্তা ও ভাবনার জগৎকে শতবর্ষ আগে বা পিছনে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের ক্রমাগত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অবিশ্বাসের অদৃশ্য শক্তি।

আমার পর্যবেক্ষণ, অবিশ্বাসের এক অসম্ভব শক্তি আছে যা মানুষের ভেতর থেকে ক্রিয়া করে। এটা তো ঠিক মানুষের ভেতরের শক্তি যে কোন বহিঃশক্তির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ধারণ করে।

আমরা ছুটে চলেছি সামনের দিকেই, পেছনের দিকে নয়। আর তার একটা শক্তি আসছে অবিশ্বাস থেকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা নেতিবাচক সত্তা কাজ করে। এই নেতিবাচক সত্তা মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি করে, কি, কেন ও কোথায়। নেতিবাচক সত্তা মানুষের অস্তিত্বে সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হাজির করে। মানুষের মধ্যে ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকে এক শূন্যতা। তখন মনে হয় যেন এই বিশ্বাসই তার শূন্যতাকে গ্রাস করবে। আসলে শূন্যতাই বিশ্বাসকে গ্রাস করে। শূন্যতাকেই অবিশ্বাসের যুক্তি দিয়ে পূর্ণ হয়। অবিশ্বাস মানুষকে পূর্ণতা এনে দেয়। তার অন্তঃস্থিত শূন্যতাই তার অমূল্য সম্পদের মত কাজ করে। যুক্তিবাদী মানুষের আশঙ্কা - বিশ্বাস তার অস্তিত্বকেই শেষ করে দেবে হয়ত। সেজন্যেই ঘুরে দাঁড়ায় মানুষ, শুরু হয় তার জিজ্ঞাসা- কি, কেন, কোথায়। একটা অবিশ্বাস তাকে পৌঁছে দেয় গন্তব্যে।

গতানুগতিক চিন্তা ভাবনার বাইরেই আমার এই উপস্থাপনা। সেখান থেকে বেরিয়েই একটা অন্য প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার এই লেখা। পাঠককেও আমার অনুরোধ আসুন আমার প্লাটফরমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একই দূরবীনে বিষয়টা দেখি। না হলে আমার যুক্তি মানতে আপনি ইতস্ততঃ বোধ করবেন। পাঠক হয়ত কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতেও পারেন আমার এই ধরণের অনুরোধে।

আমার ধারণাগুলোকে পাঠকের মাঝে উপস্থাপন করতে ইচ্ছাপোষণ করেছি একটা উপকারের তাগিদে। যারা চোখ বন্ধ রেখে বিশ্বাস করতে বলেন তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমার এই আবেদন।

অবিশ্বাসের তাড়না ও গতি অনুধাবন করতে হলে বিশ্বাসের সংজ্ঞার নিকট পৌঁছনোর প্রয়োজন। বিশ্বাস হচ্ছে প্রমাণ ছাড়া কোন ঘটনা বা তথ্যকে মেনে নেওয়া ও মনে নেওয়া এবং সম্পূর্ণ বিতর্কহীন আস্থায় রাখা। বিশ্বাস একটা আবেগ নির্ভর আস্থা। প্রশ্ন করা চলবে না , 'কি বা কেন?' তবেই সেটা বিশ্বাস।

যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলেই ধরে নেওয়া হবে আপনার মনে অবিশ্বাস উঁকি দিচ্ছে। সত্য মিথ্যা বা অস্তিত্ব যাচাই না করেই হ্যাঁ বলে দেওয়াটাই বিশ্বাস। বিশ্বাস হচ্ছে চোখ বন্ধ রেখে অন্ধ হয়ে সব শুনে যাওয়া আর প্রতিবাদ না করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানানো। এখানেই আমার আপত্তি, এখানেই আমার যুক্তি। Belief without evidence is Faith that keeps you blind.

কেউ বলতেই পারেন, 'আরে মশাই, আপনার কথা আপনি বলতে চাইছেন, বলুন না। মানা বা না মানা সে তো আমাদের ব্যাপার। আপনি তো আপনার মতামত আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।' আমার এই লেখা এজন্য যে আমার জীবনে আমি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছি আলাদা ভাবে এবং অনেক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি ডায়েরির পাতায়। সেগুলো আমি মানুষকে জানাতে চাই। সেগুলো যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তাহলে লেখার কি মূল্য? অবশ্য যুক্তি গ্রাহ্য হবে কি না সেটা সময় বলবে।'

মনের গতিপথ কি?-মানুষের মন কি সদা সর্বদা সহজ সরল পথ ধরে চলে? মানুষের মনের অলিগলিতে সদা সর্বদাই উঁকি দেয় প্রশ্ন। প্রশ্ন উত্থাপন মানেই অবিশ্বাস। যতই মানুষ আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক যুগের দিকে এগিয়েছে ততই প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মনে জেগেছে নানান প্রশ্ন। আর উত্তর খুঁজেছে। উত্তর খুঁজতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষ ছুটে বেড়িয়েছে। পাল তোলা জাহাজে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। পর্বত শিখরে উঠেছে জীবন বাজি রেখে। প্রিয়ার মুখের মত সুন্দর চাঁদকে দেখতে চেয়েছে স্বচক্ষে, চন্দ্রযান পাঠিয়েছে মানুষ।

পণ্ডিতেরা এতকাল বলছেন, 'আমাদের কথা বিশ্বাস কর না কেন? বিশ্বাস রাখো না কেন আমাদের উপর? আমরা যা বলি সেটাই সত্য, আমরা যা বলি তাই মান্য করে চল।' ধর্মীয় সাধুরা বলেছেন,'আমরা ধর্ম নিয়ে যা বলি ভক্তিতে শুনে যাও আর বিশ্বাস করে যাও। ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করো না। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা চেও না। শুধু মান্য করে যাও। ধর্মের সমালোচনা করো না। ধর্মের সমালোচনা করা পাপ।'

পাপ শব্দটি কানের ভিতর প্রবেশ করানো হয় তপ্ত লৌহ শলাকার মত। এমন ভাবে যেন আর টু শব্দটি করতে না পারে। অবিশ্বাস করলেই পাপ হবে। পাপ মানে নরকবাস। নরকের আগুনে জ্বলতে হবে হাজার হাজার বছর। এই অন্ধত্বের মধ্য দিয়ে মানুষ হাজার বছর পার করেছে।

আমি মিশর বেড়াতে গিয়েছিলাম ২০০৮ সনে। গিয়েছিলাম শুধু ভ্রমণের জন্য নয়, মানুষের ক্রমবিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা জানা যাবে সেই আশায়। মানুষকে জানতে হলে ইতিহাস জানতে হবে তাদের। পাঁচ হাজার বছর আগে তারা মমি বানিয়েছিল। পিরামিড বানিয়েছিল। এগুলো কোনটিই শখ করে বানায়নি তারা। পাঁচ হাজার বছর আগের সময়কার মানুষের জীবনযাত্রা তারা লিপিবদ্ধ করে রাখত শিলালিপিতে। তাদের একটা নিজস্ব ভাষা ছিল, বলা হয় হাইরোগ্লাইফিক্স। এ সকল লেখা কায়রো জাদুঘর, মিশরের বহু জায়গায় ও পিরামিডের মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

হাইরোগ্লাইফিক্সের লেখা পাঁচ হাজার বছর আগের। মানুষ সহজে তার পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। হাইরোগ্লাইফিক্সের পাঠোদ্ধারের জন্যে সময় লেগেছিল কয়েকশ' বছর। নবম ও দশম শতকে ধূল, নুন, আল- মিশরি ও ওয়াহশিয়ারের সময়ে প্রথম পাঠোদ্ধারের চেষ্টা হয়। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যাথেনাসিয়াস কারসার তার লেখা লিঙ্গুয়া অ্যাজেপ্টিয়াসা রেসটিটুয়া বইয়ে হাইরোগ্লইফিক্সের উচ্চারণ ও অর্থ বেশ কিছুটা লিখেছিলেন। মানুষের আদিম যুগ থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক যুগে উঠে আসার যে ধাপ তা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছিল। শুধুমাত্র হাইরোগ্লাইফিক্সের কল্যাণে মিশরের ইতিহাস থেকে বিশদে জানা গেছে। অন্য কোথাও এমন বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

এবার বলি মিশরে কি জানা গেল আর তার সঙ্গে আমার বর্তমান উপস্থাপনা অবিশ্বাসের সম্পর্ক কি। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিশরের যে শাসক ছিল যারা তাদের বলা হত ফারাও। ফারাওরা নিজেদের সরাসরি ঈশ্বর মনে করত এবং প্রজাদের মধ্যেও সেই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রজারা ফারাওদের ঈশ্বর জ্ঞানেই পুজো করত ও মান্য করত। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি কখনো সাধারণ মানুষের সাথে বিয়ে করতে পারে না, তারা ঈশ্বরের বংশধরকেই বিয়ে করবে, এই বিশ্বাসে ফারাওদের ছেলেরা নিজেদের আপন বোনকে বা পরিবারের অন্য মেয়েকে বিয়ে করত। ফারাওরা মনে করত মৃত্যুর পরও তারা ঈশ্বর থেকে যাবেন অথবা ঈশ্বরে মিশে যাবেন। সে জন্য তারা বেঁচে থাকতেই তাদের নিজস্ব সমাধি নিজেরা তৈরি করে যেত। মিশরের গিজাতে অবস্থিত পিরামিড গুলোতে তাদের মৃত্যুর পর তাদের দেহ রক্ষিত থাকবে সেজন্যই পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর ফারাওদের ছেলেরা তাদের পিতার দেহকে মমি বানিয়ে রাখত, এই আশাতে যে

মৃত্যুর পর দেহ যেন নষ্ট না হয়। চার পাঁচ হাজার বছর আগের সেই মমি আজও অবিকৃত অবস্থায় আছে। অনেক মমি মিশরের ভ্যালি অফ দি কিংস ও ভ্যালি অফ দি কুইন্সেও রাখা হত।

হাইরোগ্লাইফিক্সের পাঠোদ্ধারের যুগান্তকারী ঘটনা হল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট নেপোলিয়ানের মিশর অভিযানের সময় তার সৈন্যরা রোসেটা পাথর খুঁজে পায়। রোসেটা পাথরে হাইরোগ্লাইফিক্সে লেখা ছিল অনেক কিছু। নেপোলিয়ান সেই রোসেটা পাথর তার সংগ্রহে রাখেন। পরবর্তীতে উনবিংশ শতকে তিনজন পণ্ডিত সিলভেস্টার ডি ক্যাসি, জন ডেভিড অ্যাকেরব্লাড এবং টমাস ইয়ং সম্রাট নেপোলিয়ানের রোসেটা পাথর নিয়ে গবেষণা করে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেন।

সর্বশেষ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে জিন ফ্রাস্কোইস ক্যাম্পোলিয়ান হাইরোগ্লাইফিক্সের পরিপূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তার লিখিত লেটার এ এম ডাশিয়ার বইয়ে হাইরোগ্লাইফিক্সের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন। মিশরের এই হাইরোগ্লাইফিক্সের পাঠোদ্ধারের ফলেই জানা সম্ভব হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে থেকে কি ভাবে মানুষ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ছিল, কি ভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরের ধারনা মানুষের মনে প্রোথিত হয়ে ছিল। সারা বিশ্বেই একই ভাবে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের টানা পড়েন চলেছে। বিশ্বের অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা যায়নি তার কারণ সে সব জায়গায় মিশরের মত বিশদে তারা লিপিবদ্ধ করে যায়নি। যাও বা কিছু লিখেছিল তার ততটা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা যায় যে সর্বত্রই একই ভাবে মানুষের এই বড়ো হওয়া আর বেড়ে ওঠা।

এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে শুরু করল আর তারা চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজের মনের অস্থিরতা নিয়ে রুখে দাঁড়াল।

ফারাওদের শাসন ব্যবস্থার অবলুপ্তি হল এক সময়ে। মানুষ আর বিশ্বাস করল না যে ফারাওরা ঈশ্বর। মানুষই পরিবর্তন ঘটাল। ফারাও শাসন ও বিশ্বাস অবলুপ্ত হয়ে নতুন শাসকের আবির্ভাব হল। আর মানুষ জানতে চিনতে শিখল সত্যকে। অবিশ্বাস না করলে আদিম যুগ থেকে এই আধুনিক যুগে পৌঁছতে পারত না মানুষ। সমাজের পরিবর্তন সাধিত হত না, অগ্রগতি হত না।

ভুল আর সঠিককে আলাদা করল বিশ্বাস আর অবিশ্বাস দুই প্রকোষ্ঠে রেখে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে। বিশ্বাসকে তালাবদ্ধ রেখে নিজের বুদ্ধি আর নীতিকে কার্যকরী রূপ দিতে চাইল। এ ভাবেই সমাজ সুশৃঙ্খল হল, সুগঠিত হল। কুসংস্কার মুক্ত হল। সত্য আর নীতি মিলিত হল নতুন সমাজ গড়ার তাগিদে। এখানেই কাজ করে আবেগ যা মনকে শক্তিশালী করে। আবেগ

মনকে শক্তি যোগায়। আবেগ মানুষকে সঠিক পথে চলতে আলো দেখায়।

মানুষ যতই সামনের দিকে এগিয়েছে ততই তার বুদ্ধির প্রসার ঘটেছে। অথবা উল্টো করে বলাটাই হয়ত সঠিক হবে যে মানুষের যত বুদ্ধির প্রসার ঘটেছে ততই মানুষ সামনের দিকে এগিয়েছে। সামনের দিকে এগোতে গেলেই মানুষ আশ্রয় নিয়েছে যুক্তির। যুক্তির মর্মই হচ্ছে বিশ্লেষণ। জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাকেও মানুষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে আর আবিষ্কার করেছে জীবনের নতুন বৈশিষ্টকে। ভাববাদী মানুষেরা বিশ্বাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। চুপ করে বিশ্বাস করতে বসলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে যায়।

বিশ্লেষণবিহীন বিশ্বাস মানুষকে যুক্তি, তর্ক ও কর্মবিমুখ করে তোলে। ক্রমে ক্রমে এরা জীবনবিমুখ হয়ে ওঠে, এরা হয়ে ওঠে ঝগড়াটে ও বিষণ্নবাদী। এরা যুক্তি মানে না, সমালোচনা সহ্য করতে পারে না পাছে তার বিশ্বাসে আঘাত লাগে।

অপরদিকে বস্তুবাদীরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকে, অন্বেষণ করে, তাই তারা বেশি বেশি জীবনমুখী। আমরা জানি বিশ্বে দুটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়- ভাববাদ যা হল পুঁজিবাদের দর্শন বা সাম্রাজ্যবাদীদের দর্শন আর বস্তুবাদ যেটা হল সমাজতান্ত্রিক দর্শন।

যদিও ভাববাদী ও বস্তুবাদীদের বিতর্কে কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারেনি, আমিও চাই না অযাচিত দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়াতে। আমি তর্কে জিততে চাই না। যখন উচ্চমাধ্যমিকে পড়তাম তখন ডেল কার্নেগীর লেখা পড়ে জেনেছিলাম- তর্কে জেতার সহজ উপায় তর্কে যোগ না দেওয়া।

একটি উদাহরণ দেই-একসময়ে সমগ্র আরবদেশে মুর্তিপূজা হত। সেখানে অনেক মন্দির ছিল এবং সেখানে নানান দেব দেবীর মুর্তি ছিল, তখনকার বেদুঈন ও কোরায়ঈশ সম্প্রদায় মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করত। মক্কার কাবা শরিফে কোরায়ঈশদের ঈশ্বর 'হুবাল' এর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার মূর্তি ছিল অবিকল মানুষের চেহারা, হাতে তীর ও ধনুক। কাবা শরিফে আরও ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল ও তখনকার মানুষ সেখানে তাদের বিশ্বাসে পুজো করত। হজরত মোহাম্মদ এসে বললেন, মুর্তির মধ্যে আল্লাহ থাকে না। আল্লাহ নিরাকার। মুর্তি পূজাকে নস্যাৎ করে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচলন করেন ও সকল মূর্তি ধ্বংস করেন।

মক্কা ও মদিনার মানুষ তখন যদি বিশ্বাসে ভর করে থাকত, তাহলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনই হত না। পূর্বের অবস্থার অবিশ্বাস থেকেই তখনকার প্রচলিত ধারনার নস্যাৎ করা হয়েছে। আর মুর্তি পূজাকে নস্যাৎ করেই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন। পরবর্তীতে আবার ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের কিছু তত্ত্বকে অগ্রাহ্য

করেছে। তারা তাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এসকল দ্বন্দ্ব থেকেই জাতিগত বিভেদ, দাঙ্গা, যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে বহুবার। নতুন নতুন তত্ত্ব এসেছে পূর্বের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে।

Islam: A Short History, Karen Armstrong- In her book Karen Armstrongasserts that the Kaaba was officially dedicated to Hubal, a Nabatean deity, and contained 360 idols which probably represented the days of the year.However, by the time of Muhammad's era, it seems that the Kaaba was venerated as the shrine of Allah, the High God. Once a year, tribes from all around the Arabian Peninsula, whether Christian or pagan, would converge on Mecca to perform the Hajj pilgrimage, marking the widespread conviction that Allah was the same deity worshipped by monotheists. Alfred Guillaume, in his translation of the Ibn Ishaq's seerah, says that the Kaaba itself might be referred to in the feminine form. Circumambulation was often performed naked by men and almost naked by women. It is disputed whether Allah and Hubal were the same deity or different. Per a hypothesis by Uri Rubin and Christian Robin, Hubal was only venerated by Quraysh and the Kaaba was first dedicated to Allah, a supreme god of individuals belonging to different tribes, while the pantheon of the gods of Quraysh was installed in Kaaba after they conquered Mecca a century before Muhammad's time.

Hubal was a god worshipped in pre-Islamic Arabia, notably by Quraysh at the Kaaba in Mecca. The god's idol was a human figure believed to control acts of divination, which was performed by tossing arrows before the statue. The direction in which the arrows pointed answered questions asked of the idol.

আমি একথা বলছিনা যে পূর্বের অবিশ্বাস থেকে মানুষ হাতে কলমে প্রমাণ নিয়ে তবে পরিবর্তনকে মেনে নেয়। সেখানেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচলে মানুষ অবস্থান নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, ‘এক ভ্রান্তিপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অন্য ভ্রান্তিপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য মানুষের মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে।’ এটাই জাগতিক নিয়ম -এটাই মানুষের অভ্যাস। অবশ্য অভ্যাস আর বিশ্বাসের মধ্যে যেমন বিস্তর ফারাক আবার কিছুটা মিলও আছে। একটা বিশ্বাস মানুষের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এক প্রকার অভ্যাসের জন্ম দেয়। যদি কখনও তার ওই বিশ্বাস ভঙ্গ হয় তখন তার পুরনো অভ্যাসটাও সে পরিত্যাগ করে অনায়াসে।

প্রমাণ ছাড়া উপলব্ধিএকটা সন্দেহের বীজ বপন করে মস্তিষ্কে সেটাই বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। যেন মনের গোপন ঘরে জন্ম নেয় অবিশ্বাস আর ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দেয় একটা প্রতিবাদী সুর। মানুষের মনেই একটা ঘর থাকে বিশ্বাসের।

সেই বিশ্বাসের ঘরেই জন্ম নেয় অবিশ্বাস। অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে একটা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে।

ফ্লাওয়ার বলেছেন, বিশ্বের যা কিছু আনুক্রমিক ধারণা যা আস্থায় পরিণত হয় সেটাই বিশ্বাস। এখানেও প্রমাণবিহীন আস্থার কথাই বলেছেন তিনি।

বিশ্বাস দুই রকমঃ

১) প্রমাণ কর আর বিশ্বাস কর

২) প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস কর

আমার যুক্তি হচ্ছে প্রথম যে কথাটা বলা হল, 'প্রমাণ কর আর বিশ্বাস কর'- এখানে তো তাহলে প্রথমে অবিশ্বাস ছিল তাই প্রমানের কথা উঠেছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসেই সত্যের দেখা মিলল। না হলে সত্য অধরাই থেকে যেত।

আমার নিরীক্ষণ হচ্ছে হঠাৎ করেই অবিশ্বাস প্রথমে কারও মনে আবির্ভাব হয় ন। কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করেই তবে মানুষ অবিশ্বাসে পৌঁছয়। অবিশ্বাস আবির্ভাবের প্রধানত চারটি ধাপ-

১) বিশ্বাস

২) পর্যবেক্ষণ

৩) সন্দেহ

৪) অবিশ্বাস

১) বিশ্বাসঃ- উল্টোডাঙ্গার নন্দনবাবু বেশ কিছু দিন ধরেই হাই ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন। তিনি ঠিক মতই ওষুধ খাচ্ছেন। রাস্তার ওপাশের ফার্মেসির দিনু, ওকে বললেই বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে যায়। নন্দনবাবু নিয়ম মেনে চলছেন। মিষ্টি খান না। চিনি ছাড়া চা-প্রচুর সব্জি, ভাত কম, রাতে দুটো রুটি, সব নিয়ম মেনে চলছেন। রোজ নিয়ম করে এক ঘণ্টা হাঁটছেন। আগে প্রচুর ধুমপান করতেন। এখন ধুমপান ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তারের কথায়। কিন্তু কিছুদিন হল তার ব্লাড প্রেসার কমছে না। অথচ তার অগাধ বিশ্বাস তার দীর্ঘদিনের পারিবারিক চিকিৎসক বিশ্বজিৎবাবুর উপর। এমনকি নন্দনবাবুর অনেক বিশ্বাস রাস্তার উপর ফার্মেসির দিনু ছেলেটার উপর। এ পর্যন্ত ছিল নন্দনবাবুর বিশ্বাস।

২) পর্যবেক্ষণঃ- একবার নন্দনবাবুর ব্লাড সুগার রিপোর্ট আসল ৪৮০ মিলিগ্রাম (খাওয়ার পর)। তিনি ঘাবড়ে গেলেন, এর আগে তো এত বেশি সুগার হয়নি কখনো। নন্দনবাবু বিভিন্ন ল্যাবরেটারি থেকে ব্লাডসুগার পরীক্ষা করালেন। নন্দনবাবু শান্তি পাচ্ছেন না। ব্লাড সুগার হাই পাচ্ছেন সকল ল্যাবরেটারি থেকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রেসার চেক আপ করাচ্ছেন সকলেই বলছে, 'প্রেসার হাই। আপনি ঠিক মত ওষুধ খাচ্ছেন না।' অথচ তার বিশ্বাস ডাক্তার বিশ্বজিৎবাবুর উপর। বিশ্বাস রাস্তার ওপারের ফার্মেসির ছেলে দিনুর উপরও। এটা হল পর্যবেক্ষণ।

তিনি দেখছেন যে তিনি সময় মত তার পারিবারিক চিকিৎসককে দেখাচ্ছেন, সকল নিয়ম মেনে চলছেন, চেনা ফার্মেসির ছেলে দিনু বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। তার প্রেসার বা সুগার কমছে না বা নিয়ন্ত্রণে থাকছে না।-এটা হল তার পর্যবেক্ষণ।

৩) সন্দেহঃ- নন্দনবাবু ভাবতে শুরু করলেন, 'সবকিছু মেনে চলছি, অথচ প্রেসার সুগার কোনটাই ঠিক থাকছে না কেন?' সকলেই যা করেন তিনিও সেটাই করলেন। এবার তিনি ডাক্তার পরিবর্তন করলেন। বন্ধু বিভাস বলল, 'নন্দন, তুমি আমার পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে একবার দেখাও। আমি দীর্ঘ দিন দেখাচ্ছি। আমি ভালো আছি। উনি খুব ভালো- প্রেসার সুগারের চিকিৎসায়।' নন্দনবাবু তার কথামত ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে দেখালেন। তার পরামর্শ মত অন্য একটা ল্যাবরেটারিতে রক্ত পরীক্ষা করালেন। ডাক্তার গোবিন্দবাবু তাকে নতুন করে প্রেসক্রিপসান করে দিলেন। একমাস ওষুধ খাওয়ার পর আবার আসতে বললেন।

নন্দনবাবু বাড়ি এসে রাস্তার ওপারের ফার্মেসির ছেলে দিনুকে বললেন। দিনু বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে গেল। নন্দনবাবু একমাস ওষুধ খেয়ে আবার গেলেন ডাক্তার গোবিন্দবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু দেখলেন নন্দনবাবুর প্রেসার কমেনি। রক্ত পরীক্ষা করাতে দিলেন। দেখা গেল ব্লাড সুগার একটুও কমেনি। ডাক্তারবাবু নন্দনবাবুকে বকাঝকা করলেন, 'নন্দনবাবু, আপনি নিয়ম মানছেন না বলেই আপনার সুগার প্রেসার কমছে না। আপনি শুধু শুধু আপনার নিজের দীর্ঘ দিনের পারিবারিক চিকিৎসক বিশ্বজিৎবাবুর চিকিৎসা নিয়েও নানা মন্তব্য করেছিলেন।'

নন্দনবাবুও ছেড়ে কথা বলেন না। তর্ক জুড়ে দিলেন ডাক্তারবাবুর সাথে। তিনিও বললেন, 'আমি আপনার সকল উপদেশ মেনে চলেছি। মিষ্টি খাই না, বেশি ভাত খাই না, অতিরিক্ত নুন খাই না, রোজ এক ঘণ্টা নিয়ম করে হেঁটেছি। রাস্তার ওপাশের ফার্মেসির দিনু ছেলেটা ওষুধ বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে সময়মত। ওষুধও নিয়ম মেনে খেয়েছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিক আছে আমি আবার একমাসের ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ঠিকমত ওষুধ খাবেন, অবশ্যই সুগার প্রেসার কমে যাবে।' নন্দনবাবু নিজে নিজেই কুড়ি দিন পর রায়-ত্রিবেদী ল্যাবরেটারিতে গিয়ে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করালেন। দেখলেন তার ব্লাড সুগার একটুও কমেনি। অন্য ডাক্তারের কাছে গেলেন। ব্লাড প্রেসার দেখলেন। ব্লাড প্রেসারও কমেনি।-'ওষুধ ঠিক দিচ্ছে তো রাস্তার ওপাশের ফার্মেসির ছেলে দিনু?'-এবার তার মাথায় এল সন্দেহ। এটা তৃতীয় ধাপ।

৪) অবিশ্বাসঃ-নন্দনবাবুর এতদিনে মাথায় এল, তাহলে রাস্তার ওপাশের ফার্মেসির দিনু ওষুধ ঠিক দিচ্ছে তো? মানুষ এটাই করে- যুধ ঠিক আছে কিনা

না দেখে আগেই ডাক্তার ভুল করছে ভেবে বসে। ডাক্তার পরিবর্তন করে চলে অবিশ্বাসের কারসাজিতে। মানুষের অভ্যাস-বড়ো জায়গাতেই অবিশ্বাসটা আসে প্রথম। ছোটো জায়গা নজরে পড়ে না। এখানেও দিনুকে অবিশ্বাসের মধ্যেই আনেনি।

দিনু সেদিন যে সকল ওষুধ দিয়ে গেল তার বাড়িতে তখনি সে সকল ওষুধ নিয়ে নন্দনবাবু সোজা চলে গেলেন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। ওষুধ আর প্রেসক্রিপসান দেখালেন ডাক্তারবাবুকে। বললেন, 'দেখুন তো ডাক্তারবাবু, ওষুধগুলো ঠিক আছে কি না।' ডাক্তারবাবু ওষুধ দেখে তো অবাক। বললেন, 'মশাই, সঠিক ওষুধ খাচ্ছেন না বলেই তো আপনি উপকার পাচ্ছেন না। নন্দনবাবু, আপনি জানেন না বাজারে অনেক ভেজাল ওষুধ পাওয়া যায়?'

নন্দনবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কি বলছেন আপনি? ভেজাল ওষুধ খেয়ে মরব নাকি? আমি তো আমার পরিচিত ফার্মেসির ছেলে দিনুকে বলে দিই। সে ওষুধ আমার বাড়ি পৌঁছে দেয়। ফার্মেসিও নামকরা।'

ডাক্তারবাবু নন্দনবাবুকে বলে দিলেন, 'আমার প্রেসক্রিপসান দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে ক্যাশমেমো নেবেন। তারপর সেই ওষুধ এনে আমাকে দেখাবেন। আমি দেখতে চাই। ফার্মেসিতে বলবেন যে 'আমি ওষুধ কিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাব, আর তুমি ওষুধ পরিবর্তন করে দেবে না। যা লিখেছেন সেই ওষুধই তুমি আমাকে দেবে।'

নন্দনবাবু সোজা রাস্তার ওপাশের সেই ফার্মেসিতে গিয়ে ফার্মেসির মালিকের সঙ্গে কথা বললেন। ওষুধের দোকানের মালিক গজানন তো অবাক। সে বলল, 'দিনু তো অনেকদিন আপনার জন্য কোন ওষুধ আমার ফার্মেসি থেকে নেয় না। তাহলে কোথা থেকে কি ওষুধ দিল?'

'তাহলে? কোথা থেকে ও ওষুধ কেনে? দিনুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো তো'।

'সে আমি বলব আর খোঁজ খবরও নেব, সে কোথা থেকে ওষুধ এনে আপনার বাড়ি পৌঁছে দেয়। আমার ফার্মেসির সুনাম নষ্ট করছে।'

'শুধু সুনাম নষ্ট? মানুষের জীবন নিয়ে খেলা? আমার সঙ্গে দেখা করে যেন। ঠিক আছে ওষুধগুলো দাও আর একটা ক্যাশমেমো দেবে। সব নিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে বলেছেন।'

এটা হল অবিশ্বাস। আর অবিশ্বাস থেকেই মিলল উত্তর এবং সুষ্ঠু সমাধান। এভাবে চারটি ধাপ পেরিয়ে অবিশ্বাস উপস্থিত হয় এবং একটা সুরাহা হয়। বলা দরকার এরপর নন্দনবাবু আবার তার পুরনো পারিবারিক চিকিৎসক বিশ্বজিৎবাবুর কাছে ফিরে যান এবং সব খুলে বলেন। ডাক্তার বিশ্বজিৎবাবু একটা হাসি দিয়ে

নন্দনবাবুকে বললেন, 'কি জানেন নন্দনবাবু, আমাদের ডাক্তারি জীবনে এমনটা হামেশাই ঘটে। আমরা বিচলিত হই না। জানি মানুষের মনে প্রশ্ন আসবেই, 'কেন সুচিকিৎসা পাচ্ছি না?' আর সেই ছেলেটা দিনু? কোনদিন সে নন্দনবাবুর সঙ্গে দেখা করেনি। ওই ফার্মেসিতে গিয়ে দিনুর খোঁজ নেন নন্দনবাবু। গজানন বলল, 'তারপর থেকে দিনু আর ওর ফার্মেসিতে আসছে না। তার ফোন সুইসড অফ।'

এভাবেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস থেকে উঠে আসবে আসে তথ্য ও সমাধান।

যে কোন বিষয়ে যদি অগাধ বিশ্বাস থাকত তাহলে তো সেখানেই স্থির দাঁড়িয়ে যেতাম আমরা। নড়তে পারতাম না একচুলও, নড়তে চাইতাম না একটুও। বিশ্বাস আঁকড়ে নির্জীব হয়ে বসে থাকতাম, একটা জীবন্ত জড় বস্তুতে পরিণত হতাম। অবিশ্বাসই জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়, শোনার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়, দেখার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। গতানুগতিক বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সংজ্ঞা বা ধারণার বাইরে অন্য আর একটি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখাটাই হয়ত সঠিক হবে। আসুন বিতর্কে না গিয়ে ভাবি বিষয়টা, যে ডাঃ তপন বিশ্বাস কি বলছে তার অভিজ্ঞতায়, ধারণায় ও পর্যবেক্ষণে। এখানেও অবিশ্বাসকেই মাথায় রেখে শুধু শুনে যেতে বলছি , পড়ে যেতে বলছি এবং অবশ্যই আপনার মনে উপস্থিত হবে প্রশ্ন। সেটাই অবিশ্বাস, সেটাই মানুষের গন্তব্য।

সাধারণত বিশ্বাসকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে সকলের সামনে পরিবেশন করা হয়। আবার আধ্যাত্মিকতাকে অলৌকিকতার জাদুতে প্রদর্শনের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা যে আলাদা তাও গুলিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। তাই বিশ্বাস শব্দটি মিথ্যা দ্বারা গ্রহণযোগ্য করার প্রবণতাও সর্বদা সর্বত্র। এভাবেই বিশ্বাস মানুষকে অন্ধকারে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করে।

বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের নামে দাবিয়ে রাখার একটা যুক্তি হিসাবে কাজ করে। কিং জেমস বলেছেন 'বিশ্বাস মানুষকে আশার বানী শোনায় যে সকল বিষয়ে প্রমাণ নেই সে সকল অদেখা গল্পের ভরসায়। ' বিশ্বাস এমন এক আশ্বাস দেয় বা নিশ্চয়তা দেয় যা চোখে দেখা যায়নি এমন সব কাহিনীর উপর ভিত্তি করে।

প্রায় সকল ধর্মেই এমন কিছু অদেখা কাহিনীকে অনেক বড়ো করে দেখাতে গিয়ে ধর্মের মূল ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। অলৌকিকতা ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। নিজের ধর্মকে অন্যের ধর্মের চেয়ে বড়ো- এভাবে এগিয়ে দিতে গিয়ে প্রমাণবিহীন অলৌকিক কাহিনীর প্রচার করে মানুষের মনের অন্দরে আসলে অবিশ্বাসকেই খুঁচিয়ে তোলা হয়। এই কারণেই পৃথিবীতে এত ধরনের মতবাদে নানান ধর্মের উপস্থিতি। নানান রকমের ঈশ্বরের উপস্থিতি। একটি মতবাদের প্রতি অবিশ্বাসে আরেকটি ধর্মীয় মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে।

সকল ধর্মেই কিছু ভালো কথা আর কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রমাণ ছাড়া বর্ণিত

আছে। এগুলো কথা একদিন সুকুমারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। সুকুমারবাবুও বেশ উদার মনের মানুষ। বড়ো মনের মানুষ। তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কি ঈশ্বরকেই অস্বীকার করে ফেলছেন?' আমি বললাম, 'তা কেন? ভণ্ডামিগুলো তুলে ধরে আমি আমার অবিশ্বাসের তত্ত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। সুকুমারবাবু, আমার তত্ত্ব কারো পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'অবিশ্বাসেই মুক্তি। অবিশ্বাসেই যুক্তি। বিশ্বাস মানুষকে দাসে পরিণত করে।' সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারবাবু বললেন, 'আপনি বরং 'অন্ধবিশ্বাস' শব্দটি ব্যবহার করুন। না হলে আপনার অনেক কাছের মানুষ অকারণে আপনার সমালোচনা করতে বসে যাবেন। ' আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম । সুকুমারবাবু হয়ত বুঝলেন যে আমি তার কথায় পূর্ণ সহমত হলাম না।

অনুগত দাস অর্থ দিয়ে তৈরি করা যায় না, কিন্তু বিশ্বাসের অনুশাসনে একটি মানুষ দাসত্ব মেনে নিয়েও পুলক অনুভব করে। একই ভাবে ধর্মের নামে অনেক আজগুবি কথা বিশ্বাস করানো হয়। মানুষ সেগুলো বিশ্বাস করেও। ধর্মের নামে পরলোকে অনেক কিছু পাইয়ে দেওয়ার কথাও শোনানো হয়। কল্পকাহিনীর দ্বারা মৃত্যুর পর নানা রকম প্রাপ্তির গল্প শোনানো হয় এবং কিছু লোক বিশ্বাসও করে। অনেককে বিপথগামী করে অনিষ্টকর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আত্মঘাতি হতেও প্রলুব্ধ করা হচ্ছে অনেককে।

বহু মানুষ বিভিন্ন ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ খুন করছে। প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে। খুন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে কাজ করে অন্ধবিশ্বাস। অন্য ধর্মের মানুষের ক্ষতি করতে তাই বাঁধে না তখন। বিধর্মীর স্ত্রী বা কন্যাকে ধর্ষণেও পুণ্যলাভ হয় এমন ভয়াবহ বিশ্বাসের কথা কোন কোন ধর্মের নামে প্রচার হয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাস মানুষের বিবেককে বন্দি করে রাখে এবং হিংস্র ও উন্মত্ত করে দেয়। সব সময়ই কি আমাদের মাথায় এটা কাজ করে না যে, যা দেখছি এটাই সব নয়? যা দেখছি এটাই সঠিক নয়। আরও কিছু হয়ত রয়েছে পিছনে, যা হয়ত এখনও দেখা হয়নি। এখন যা শুনলাম বা যা যা শুনছি সব ঠিক শুনিনি হয়ত। আরও কিছু ছিল শোনার বাকি, আরও কিছু ছিল দেখার বাকি। এটাই অবিশ্বাস। এটাই চালিকা শক্তি মানুষের। বিশ্বাস সব সময় দাবি করে প্রশ্নাতীত আনুগত্য। বিশ্বাস কানের কাছে বলে, 'প্রশ্ন করো না। শুধু অনুগত থেকে যাও জনম ভর।'

যে কেউ কিছু বললে মানুষ ভাবে, লোকটা যা বলল সব ঠিক বলেছে কি? একটিই সন্দেহ কাজ করে মস্তিষ্কের কোষে, যা বলল সব কথা বলল কি?

আমি আমার চেম্বারে রোগী দেখার সময়ে দেখেছি, যাকে চিকিৎসা করলাম,

তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, 'ডাক্তারবাবু আমার রোগটা কি?' আমি তাকে যথা সম্ভব বুঝিয়ে বলার পরও একটা 'কিন্তু' তার মনের মধ্যে থেকেই যায়। পরক্ষণেই অন্য ডাক্তারের একগাদা প্রেসক্রিপশান আর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাগজ বের করে দেখিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন যে আপনি যা বললেন ওই ডাক্তারবাবু ঠিক একই কথা বলেননি, তিনি হয়ত রোগটি ধরতে পারেনি। অথচ দেখলাম ওই ডাক্তারবাবুর ডায়াগনোসিস আর আমার ডায়াগনোসিস এক। দুই ডাক্তারের লেখা ওষুধের তারতম্য বিশেষ কিছু নয় সেটা তাকে বললেও তিনি বিশ্বাস করেননি। এটাই স্বাভাবিক এটাই মানুষের সহজাত অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসই মানুষকে গতি এনে দেয় কোন কোন ক্ষেত্রে সেটাও দেখেছি। মানুষ ডাক্তারকে পয়সা দিচ্ছে, সে একটু জেনে নিতে চাইলে ডাক্তারবাবুর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। বরং বুঝিয়ে বললে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়, তার প্রশ্নের উত্তরতাকে তো পেতেই হবে।

অনিশ্চয়তাই মানুষের চলার শক্তি। এই যে অবিশ্বাস এটাই অক্সিজেন। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অবিশ্বাস। এভাবেই মানুষ রহস্য ভেদ করে চলেছে একের পর এক। আবিষ্কার করেছে নতুনকে। ফুটেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। মানুষ ডুব দিয়েছে পাহাড় থেকে পাতালে।

বিশ্বাস সকল গতিকে স্তিমিত করে দেয়, সমস্ত প্রাণশক্তিকে কেড়ে নেয়। মানুষ জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে। প্রাপ্তির অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে। যদি মানুষ স্থির বিশ্বাসে অবিচল থাকত। যদি কথাটি অবিচল মাথার মধ্যে সেঁটে থাকত তাহলে সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ বেরোতে পারত কি? এই আধুনিক যুগে পৌঁছোতেই পারত না মানুষ। তাই যখন কেউ অবিশ্বাস করে কোন কিছুতে আমি তার দোষ দেখিনা। বরং উৎসাহিত বোধ করি যে-না, এই মানুষটির আরও জানার ইচ্ছা আছে। যখন মানুষ আমার কথায় সন্তুষ্ট হল না, আমি হতাশ হই না। বরং ভাবি মানুষটির জানার ইচ্ছা আমার চেয়েও প্রবল।

যখন কেউ সত্য বললেও আমাকে দোষারোপ করে, 'আপনি আমাকে সঠিক বলেননি।' তখন ভেবেছি আমি যা জেনেছি শুধু তাই বলেছি। এর বাইরেও হয়ত আরও জানার ছিল, আমি জানতে পারিনি বা জানার চেষ্টা করিনি। এই লোকটিই এবার আরও বেশি জানবে, আমার চেয়েও অনেক বেশি।

যদি মানুষ বিশ্বাস করে থাকত যে ঈশ্বরের নির্দেশে চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তাহলে কূপমণ্ডূক হয়ে ঘরে বসে থাকত সকলে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ জেনেও অবিশ্বাস থেকে মানুষ আবিষ্কার করল যে পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকেও প্রচলিত ধারণা ছিল যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র

হচ্ছে পৃথিবী আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ঘুরছে সূর্য, চন্দ্র ও সকল গ্রহ নক্ষত্র-এটা টলেমিক ও জিওসেন্ট্রিক মডেল তত্ব। আর ধর্মগ্রন্থতো আছেই। ঈশ্বরের নির্দেশে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। সেই বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিলেন পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস।

১৪৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পোল্যান্ডের ক্রাকো একাডেমিতে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস প্রচুর গবেষণা করেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে টলেমিক ও জিওসেন্ট্রিক মডেলের বিশ্বাস ভুল। তিনি দেখলেন পৃথিবী নয়, সূর্যই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। কোপারনিকাসের সময়ে টেলিস্কোপেরও আবিষ্কার হয়নি। তিনি খালি চোখেই গবেষণা করেছেন আর পুরোনো বিশ্বাসকে পরিবর্তন করেছিলেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইতালির জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ গ্যালিলিও সমর্থন করেন কোপারনিকাসকে। তিনিও দেখলেন যে পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। পোপ আরবান-অষ্টম তখন এক বিচারের প্রহসন করেন ও গ্যালিলিওকে আজীবন কারাবন্দীর নির্দেশ দেন। কারাগারে শিকল পরেও অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েও তিনি তার ভেতরের অবিশ্বাসকে অস্বীকার করেননি। পুরাতন ভ্রান্ত ধারণাকে অবিশ্বাস করেছিলেন। গ্যালিলিও আর সত্য সন্ধান করতে গিয়ে আমৃত্যু কাটালেন বন্দিশালায়। এভাবেই এগিয়েছে মানুষ ও পৃথিবী। অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করে নয়, প্রশ্নাতীত আনুগত্য নয়, অনুসন্ধিৎসু মনই খুঁজে বের করে চলুক নতুন তথ্য আর নিত্য নতুন ধারণা।

অবিশ্বাস একটি শক্তি, অবিশ্বাস একটি অভ্যাস। এটি মনকে চালনা করে অজানার দিকে, ব্যস্ত রাখে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ে, যে লড়াইয়ে আমি যা জানি তাকেই নস্যাৎ করার লড়াই। নিজের বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে নতুনকে আবিষ্কার করার ঝোঁক মানুষের মধ্যে এক আজন্ম প্রবণতা। আমিও প্রতি মুহূর্তে আমার অবিশ্বাসকে এগিয়ে রাখি আমার বিশ্বাসেরও আগে। প্রতিযোগিতায় আমি প্রতিদিন আমার বিশ্বাসকে পরাস্ত করি আর নতুনের সন্ধান করতে চাই। সে মানুষের মন হোক আর জাগতিক বিষয় হোক অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকার অপর নাম জীবন বলে মনে করেছি আমি। তাই আবারও বলব, অবিশ্বাসেই মিলায় বস্তু। একথা বলতে গিয়ে এক অবিশ্বাসের নষ্টকাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। অবিশ্বাস যখন কণ্টকাকীর্ণ পথে হাঁটে তখন নতুন কিছু আবিষ্কারের পরিবর্তে বড়ো রকমের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

রথিন ও অনুশ্রী দুজনে দুজকে ভালোবেসে বিয়ে করল। রথিন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। রাজ্য সরকারের অধীনে টালিগঞ্জে বিদ্যুৎ অফিসে চাকরি করে। নয়টা পাঁচটা অফিস। জরুরি দায়িত্ব পড়লে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় রথিনের। অনুশ্রী

অ্যাপোলো হাসপাতালে এইচ আর ও (হিউম্যান রিসোর্স অফিসার)। তার অফিস ডিউটি আটটা পাঁচটা। টালিগঞ্জে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে রথিন। পরপর কয়েকদিন রথিন অফিস থেকে দেরি করে বাড়ি ফিরছে। অনুশ্রী জিজ্ঞেস করলে রথিন বলেছে এমারজেন্সি ডিউটি ছিল। তাই ফিরতে রাত হয়েছে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখলে অনুশ্রী রথিনের মোবাইলে ফোন করে। এরমধ্যে কখনও কখনও রথিনের মোবাইল ব্যস্ত পেয়েছে। বাড়ি ফিরলে রথিন দেখে অনুশ্রী গম্ভীর। রথিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে অনুশ্রী, চুপ কেন?' অনুশ্রী কিছু বলে না।

অনুশ্রীও মাঝে মাঝে হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেরি করছে। রথিন জিজ্ঞেস করলে অনুশ্রী বলে,'কাজের চাপ ছিল। 'কোনদিন বলে, 'হাসপাতাল কমিটির মিটিং ছিল। ' একদিন দুপুরে অনুশ্রী সোজা রথিনের অফিসে গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখল রথিন ওর অফিসে নেই। ওর অফিস থেকেই ফোন করল অনুশ্রী। বলল, 'রথিন, তুমি কোথায়?'

রথিন বলল, 'আমি অফিসে।'

অনুশ্রী অফিসের বড়োবাবুর কাছে জিজ্ঞেস করলে বলল, 'স্যার, সাইটে গেছেন।'

'কোন সাইট?'

-'সে তো ম্যাডাম, বলতে পারব না কোন সাইটে গেছেন।'

বিকেলে রথিন বাড়ি ফিরল।

ঘরে ঢুকতেই রথিনকেচেপে ধরল অনুশ্রী, 'তুমি অফিসে ছিলে না আজ। কোথায় ছিলে বল। '

'আমি কাজের সাইটে গেছিলাম।' 'তাহলে তুমি বললে কেন যে তুমি অফিসে আছো?'

'তখন তো অফিসের কাজেই ছিলাম সাইটে।'

-'তুমি অফিসের কাজে ছিলে না। অন্য কোথাও অন্য কারো সাথে ছিলে।'

-'বিশ্বাস কর অনুশ্রী, আমি অফিসের কাজেই ছিলাম।'

শুরু হল অবিশ্বাস। এ এক অন্য অবিশ্বাস। অনুশ্রী এরপর থেকে যখন তখন রথিনের অফিসে গিয়ে হাজির হয়। অফিসের লোকজনের কাছে ফোন করে জানতে চায়, 'কোথায় রথিন?'

অফিসের লোকজন রথিনকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কেউ বা ওকে দেখে মুচকি হাসে। কেউ বা টিপ্পনী কাটে। রথিন বাড়ি ফিরলে রথিনের জামা শুঁকে দেখে অনুশ্রী,জামায় কারো গন্ধ পাওয়া যায় কি না। কলারে ভালো করে দেখে লিপস্টিকের দাগ লেগে আছে কিনা। কোট পরীক্ষা করে দেখে- কোন চুল লেপটে আছে কিনা। দূরত্ব বাড়ে দুজনের ধীরে ধীরে। ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে থাকে ওদের মধ্যে।

অবিশ্বাস অনুশ্রী ও রথিনের মাঝে বাসা বেঁধেছে গভীরে। অবিশ্বাস অনুশ্রীর মনের ভাঁজে ভাঁজে। অনুশ্রী খোঁজে রথিন কোথায় যায়। অনুশ্রী ওর হাসপাতালে ঠিক মত কাজ করতে পারে না। রথিন মনমরা হয়ে অফিসে ঢোকে। সারাদিন এক অস্থিরতা নিয়ে কাজ করে রথিন। রথিনের পাশের টেবিলে তানিয়া সেও লক্ষ্য করে রথিনকে। তানিয়া একই অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। একদিন তানিয়া রথিনকে বলে, 'স্যার, আপনার কি হয়েছে? রোজই দেখি মনমরা হয়ে অফিসে বসে থাকেন। কোন প্রবলেম?'

'না না, কোন প্রবলেম নয়। সব ঠিক আছে।'

'না, স্যার লুকোবেন না। আজ কিছুদিন লক্ষ্য করছি আপনাকে। আমি কি আপনাকে হেল্প করতে পারি?', সহানুভূতির স্বরে বলে তানিয়া।

'না না এমনই। মনটা ভালো না।'

'স্যার আমরা মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারি। আপনার মনটা ঠিকই ভালো নেই।'

রথিন চুপ করে থাকে। সব বলতে পারে না তানিয়াকে। বলতে চায় না ঘরের কথা তানিয়াকে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের সময় রথিন তানিয়াকে বলে, 'চল পিটার ক্যাট রেস্টুরেন্টে যাই । আজ ওখানে লাঞ্চ করব।'

তানিয়া ভাবতে পারেনি হঠাৎ রথিন এমন প্রস্তাব দেবে। তানিয়া ইতস্তত করছে দেখে রথিন তানিয়ার হাত চেপে ধরে নিজের হাতে। এক প্রকার জোর দিয়েই বলে, 'তানিয়া, আজ মনটা আমার খুবই অস্থির। চলো প্লিজ। তোমার সাথে লাঞ্চ করব।'

তানিয়া আর না বলেনি। পিটার ক্যাটে একটা নিরিবিলি টেবিলে ওরা অনেকটা সময় কাটাল, লাঞ্চ করল, গল্প করল। ফেরার সময় ওয়েটারকে দুশো টাকা টিপস দিল। দুপুর দেড়টায় বেরিয়ে ওরা প্রায় সাড়ে তিনটেয় অফিসে ফিরেছিল সেদিন। অফিসের অনেকে লক্ষ্য করল- আজ রথিনবাবু ভালো মুডে।

সেদিন অফিস ছুটি হলে তানিয়াকে নিজেই ওর গাড়িতে রাসবিহারী এভিনিউের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরল রথিন। আমি যদি এখানেই থামি তবে পাঠক বলবেন, 'এ আর এমন কি? এমন তো হতেই পারে।' পাঠক হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, 'এরপর? এরপর কি হল? সেটা বলুন।'

আমার সোজা উত্তর, 'রথিনের গাড়ি নিশ্চয়ই শুধু একদিন তানিয়াকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেয়নি। রথিন আর তানিয়া নিশ্চয়ই শুধু একদিন পিটার ক্যাটে লাঞ্চ করতে যায়নি।'

অফিসের লোকজনের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হল। ঘটনা যেমন এগোতে থাকে গল্পের শাখা প্রশাখা তেমন গজাতে থাকে। অনুশ্রীর কানেও খবর পৌঁছে গেল।

একদিন অনুশ্রী অফিসে এসে তানিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে গেল। তানিয়াও ছেড়ে কথা বলেনি সেদিন। সেও বলল, 'দেখ অনুশ্রী, তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। রথিনের সঙ্গে আমার কোন খারাপ সম্পর্ক নেই। সে আমার অফিস কলিগ- বন্ধু, ব্যাস এটুকুই।'

অনুশ্রী বলল, 'সব বুঝেছি, তোমার জন্যই আমার স্বামী বিগড়ে গেছে। একটা বাজে মেয়ে তুমি। একটা নোংরা মেয়ে তুমি।'

অফিসের সকলে মিলে ওদের ঝগড়া থামায়। নিন্দুকেরা বলতে লাগল, 'ছি ছি রথিনবাবু, এভাবে সকলের সামনে আমাদের অফিসের মর্যাদা নষ্ট করলেন? তানিয়া একটা ভালো মেয়ে, তাকেও আপনার স্ত্রী এভাবে অপমান করল? ছি ছি।' আমি এ পর্যন্তই শুনেছিলাম। ঘটনা কখনই এখানে থেমে থাকে না।

অনুশ্রী রথিন আর তানিয়ার ঘটনা এ পর্যন্তই জেনেছিলাম। তারপর আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওদের কোন খোঁজ খবর জানি না অনেকদিন। একদিন আমি আর দীপালী সাউথ সিটি মল থেকে সিনেমা দেখে বেরচ্ছি। দেখি অনুশ্রী ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে-ওরাও সাউথ সিটি মলে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, অনুশ্রী, না?'

আমাকে প্রণাম করল অনুশ্রী, বলল 'কেমন আছ তুমি?'

বললাম, 'ভালো, তোদের খবর বল। রথিন কেমন আছে? তোর কোন খবর হলো? মানে কোন ছেলে বা মেয়ে?' চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেল অনুশ্রীর। বলল, 'দুই বছর হল আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। রথিন তানিয়াকে বিয়ে করে অন্য একটা ফ্লাটে উঠেছে । শুনেছি ওদের একটা মেয়েও হয়েছে।'

'আর তোর? তোর কি অবস্থা?'

'আমার অবস্থা ভালো। অ্যাপোলো হাসপাতালেই আছি। বেশ আছি।'

'একাই আছিস না বিয়েটিয়ে কিছু করেছিস?'

'নাহ। একাই আছি। ভালো আছি। বেশ আছি।'

পাশের একটা দোকানে ঢুকেছিল দীপালী। ওর ডাকে সাড়া দিলাম, 'কি গো, যাবে না? চল। আমরা গেলে তবে রাজেশ আর বউমা কোথায় যেন বেরোবে।'

অনুশ্রীর থেকে বিদায় নিলাম। অনুশ্রীর মাথায় হাত রেখে ছোট্টো করে বললাম, 'ভালো থাকিস।' দীপালীর হাত থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়ি পার্কিংয়ের দিকে এগোলাম দুজন। আমি আর পেছন ফিরিনি। এটা ছিল অবিশ্বাসের অন্য একটা অধ্যায়। এ অবিশ্বাস থেকে সাবধান হলে বড়ো বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। পাঠক, আপানারাও দেখবেন আপানাদের আশেপাশেও এমন ঘটনা ঘটেছে শুধু অবিশ্বাসের কারণে সংসারে অশান্তি, আর অশান্তি থেকে ভাঙন।

Faith is an acceptance that something exists or is true, especially

one without proof. Faith, derived from Latin fides and Old French feid, is confidence or trust in a person, thing, or concept. In the context of religion, one can define faith as confidence or trust in a particular system of religious belief Religious people often think of faith as confidence based on a perceived degree of warrant, while others who are more skeptical of religion tend to think of faith as simply belief without evidence.

Fowler defines faith as an activity of trusting, committing, and relating to the world based on a set of assumptions of how one is related to others and the world. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. - King James.

Now faith is the assurance that what we hope for will come about and the certainty that what we cannot see exists.- International Standard Version. Faith was defined as a state similar to enlightenment, with a sense of self-negation and humility.

Faith causes change as it seeks a greater understanding of God. Faith is not only fideism or simple obedience to a set of rules or statements. Before Christians have faith, they must understand in whom and in what they have faith. Without understanding, there cannot be true faith, and that understanding is built on the foundation of the community of believers, the scriptures and traditions and on the personal experiences of the believer. In English translations of the New Testament, the word "faith" generally corresponds to the Greek noun -pistis or to the Greek verb -pisteuo, meaning "to trust, to have confidence, faithfulness, to be reliable, to assure.

অনিশ্চয়তা
(Uncertaininity)

মানুষ অসচেতন ও অবচেতনমনের মধ্য দিয়ে দিনের কিছুটা সময় অতিবাহিত করে আর তখন কি যেন সন্ধান করে অথচ তার নাগাল পায় না-সেটাই হল অনিশ্চয়তা। অবিশ্বাস নিয়ে লিখতে গিয়ে যেমন বলেছি যে এটা আবেগ নয়, এখানেও বলছি অনিশ্চয়তা কোন আবেগ নয়। অনিশ্চয়তা বেশ কিছু আবেগ ও মানুষের অবস্থানের এক যৌগ উৎপাদন। তাই আমি এই গ্রন্থেই অনিশ্চয়তা নিয়ে আমার কথাগুলোর অবতারণা করতে চাই- আলোচনা সহজ হবে।

শিশুর জন্মের পর থেকেই শুরু হয় তার অনিশ্চয়তার প্রভাব। ভবিষ্যৎ শব্দটিও অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের যে কোন ভাবনাই এক অনিশ্চয়তার ভাবনা। ভবিষ্যতের অপর নাম অনিশ্চয়তা। অতীত সে তো চলেই গেছে ইতিহাসের পাতায়। আর বর্তমান? সে সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী। এই আছে- এই নেই।

এই আছে একটু পরই বর্তমান চলে যাবে অতীতের গর্ভে-প্রতি মুহূর্তে ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ করছে। তাহলে সামনে পড়ে থাকল ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ ভবিষ্যৎই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই ভবিষ্যৎ যাকে আমাদের একমাত্র সম্বল মনে করছি, যার ভরসায় আমাদের বেঁচে থাকা, তা বসে আছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে,- অনিশ্চিত শব্দটিকে আশ্রয় করে। শুধু এক অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে, অস্পষ্ট ছবি নিয়ে। অনিশ্চয়তা ভাবনাটির আনাগোনা একটা বিপদের আশঙ্কা নিয়ে।

বারাসাতের অধিকারীবাবুর মেয়ে সুলতার বিয়ে আগামীকাল। মেঘলা আকাশ। আগামী কাল বিয়ের অনুষ্ঠান অথচ কাল বৃষ্টি হবে কি হবে না কেউ বলতে পারছে না। আকাশের কালো মেঘ অধিকারী বাবুকে সারাক্ষণ দুর্ভাবনায় রেখেছে। কারণ বৃষ্টি সকলের নিকট এই বিয়ের মরশুমে অনাকাঙ্ক্ষিত। বৃষ্টি হলে বিয়ের অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এখানে একটি অস্বচ্ছ ধারনা মস্তিষ্কে বিরাজ করছে যে বৃষ্টি হতেও পারে আর যদি বৃষ্টি হয় তবে সমূহ সমস্যা। সত্যি কথা হল ভবিষ্যৎ অস্বচ্ছই। অস্বচ্ছ ধারনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি চলে আসে সেটি হল ঝুঁকি। অর্থাৎ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অধিকারীবাবুকে বিয়ের অন্যান্য সকল

আয়োজন করতে হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রেই করতে হয়। যেমন বৃষ্টি না হলে বরযাত্রী আর নিমন্ত্রিত আসবে হয়ত পাঁচশো আর যদি বৃষ্টি হয় তবে বরযাত্রী আর নিমন্ত্রিত আসবে হয়ত একশো। তাহলে খাবারের আয়োজন কতজনের জন্য করতে হবে? একশো না পাঁচশো? এখানে চারশো জনের অর্থনৈতিক ঝুঁকি চেপে বসল অধিকারীবাবুর মাথায়। বৃষ্টি হলে একশো জন বরযাত্রী খাবে আর ক্যাটারারকে চারশো জনের খাবারের টাকা বেশি দিতে হবে। একটা বিরাট অঙ্কের টাকার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।

এভাবে অনিশ্চয়তা ক্ষতি ডেকে আনে। অধিকারীবাবুর মেয়ে সুলতা যার কাল বিয়ে তার অনিশ্চয়তার শঙ্কা হচ্ছে বৃষ্টি হলে লগ্নের আগে বর পৌঁছতে পারবে তো? সুলতার মায়েরও ভাবনা মেয়ে যেন লগ্নভ্রষ্টা না হয়। একই অনিশ্চয়তা থেকে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির উৎপত্তি। একই অনিশ্চয়তা জন্ম দেয় ভিন্ন ভিন্ন আশঙ্কা। সত্যি বলতে কি মানুষের মনে এই অনিশ্চিত শব্দটি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জেঁকে বসে আছে জোকের মত। উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই কারও, উন্মাদ আর মূর্খ ছাড়া।

এক অনিশ্চয়তা থেকে পরপর তিনটি বিষয়ের বা তিনটি অনিশ্চয়তার আবির্ভাব হল—অস্বচ্ছ ধারণা, ঝুঁকি ও ক্ষতি।

এখানে কাজ করছে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। কারণ জ্ঞান কোন ক্রমেই বর্তমানকে অতিক্রম করতে পারছে না। জ্ঞান থমকে যাচ্ছে ধারণার দরজায়। জ্ঞান ধারণার দরজায় মাথা ঠুকছে অবিরত। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এই কারণে যে আবহাওয়াবিদরা তাদের সকল প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ‘আগামীকাল বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’ এখানে আবহাওয়াবিদেরও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে-তিন চার দিন বা বড়ো জোর এক সপ্তাহ আগে বলতে পারে ‘বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’ কারণ নিম্নচাপটির কথা আগে ওরা জানতে পারেননি। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে তিনমাস আগে। তিনমাস আগে আবহাওয়াবিদ কি করে আগামীকালের পূর্বাভাস বলে দেবেন? তারা সকল সময়েই একটি শব্দ জুড়ে দেন- তা হল ‘হয়ত বা সম্ভাবনা’ অর্থাৎ ঝুঁকি নিয়েই সকলকে আগামীদিনের কাজে নামতে হয়, পরিকল্পনা করতে হয়। পরিকল্পনাও অনিশ্চয়তার একটি সহোদর। পরিকল্পনা করাই হয় অনিশ্চয়তাকে সম্বল করে। বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনার দূরত্ব অনেক।

অনিশ্চয়তার সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় চলে আসে-

-দুর্ভাবনা

-অস্বচ্ছধারণা

-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

-অর্থনৈতিক ঝুঁকি

-ক্ষতি

অনিশ্চয়তার এই সকল ভাবনা ও অঙ্কের সমষ্টি জন্ম দেয় আতঙ্কের । সকল অনিশ্চয়তার ধরণ ও পরিমাপ সকলে বুঝতে পারে না, হয়ত কেউই বুঝতে পারে না। সকল মানুষই একটা প্রতিকারের কথা ভেবে রাখে পূর্বাহ্নে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকারের ভাবনা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কারণ অন্য কেউই সমাধান বলে দিতে পারবে না যে আগামী কাল বৃষ্টি হবে না। সকলে সহানুভূতি দেখানোর আশ্বাস দেবে অথবা ভাগ্যের উপর ভরসা রাখতে বলবে আর একটা ছোট বক্তৃতা করে ছাড়বে। তারপর বলবে, 'দেখুন কি হয়।' নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

সে জন্যেই জন্ম গ্রহণ করেই শিশু কাঁদে। জন্মের পরই শিশু কান্না দিয়ে জীবন শুরু করে। মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার পরই তার প্রথম প্রতিক্রিয়া- কান্না, যা অনিশ্চয়তারই একটি প্রতিক্রিয়া। শিশু জন্মেই বাতাসের অক্সিজেন চায় আর মায়ের বুকের দুধ চায়।

প্রকৃতির কি আশ্চর্য ব্যবস্থা- শিশুর জ্ঞান হয়নি কিন্তু অনিশ্চয়তার জন্য সে জানান দিচ্ছে, দুধ চাই, বায়ু চাই। এরপর যতদিন জ্ঞান না হল শিশু যখনই অনিশ্চিত অবস্থার আন্দাজ করতে পারে আর তখনই কান্না। এভাবেই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই অনিশ্চিতের বিরুদ্ধে শিশুদেরও।

একবার ডাক্তারদের কনফারেন্স শেষে আমি, দীপালী আর শিলিগুড়ির ডাঃ শেখর চক্রবর্তী গাড়িতে করে শিলং থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দর আসছিলাম। প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা সময় লাগে আসতে। যারা শিলং গেছেন তারা জানেন শিলং থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দরের রাস্তাটি কি সুন্দর। দু'ধারে পাহাড় আর সবুজে ঘেরা। পথে আসতে আসতে তার সঙ্গে এই অনিশ্চয়তা নিয়ে অনেক কথা হল ওর সঙ্গে। ডাঃ চক্রবর্তী কি সুন্দর করে বললেন, 'দাদা, প্রকৃতিও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনিশ্চয়তায় ভোগে তাই প্রকৃতিও তার সন্তানদের রক্ষায় সময় থাকতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।' আমি ওকে বললাম, 'কেমন সেটা ব্যাখ্যা করে বল।' ও যা বলল কথাটা আমার মনে ধরল। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটা মস্তিস্কে থাকলেও বিষয়টাকে আমি এভাবে ব্যাখ্যা করিনি কোনদিন। ও বলল, 'দাদা, আপনি জানেন যে এক একজন মহিলার গর্ভাশয়ে বা ওভারিতে সর্বমোট চারশো পঞ্চাশটি ডিম্বাণু থাকে। একটি সন্তানের সৃষ্টির জন্য মাত্র একটি ডিম্বাণু প্রয়োজন। একজন মহিলা যদি প্রতি বছরও সন্তান জন্ম দিতে চায় তাহলে তার জীবনে সর্বমোট তিরিশ থেকে চল্লিশটি ডিম্বাণু লাগবে-পনেরো থেকে পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। সেখানে চারশো পঞ্চাশটি ডিম্বাণু কেন?' আমি ওকে বললাম, 'এ ক্ষেত্রে তোমার ব্যাখ্যা কি?'

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, 'দাদা, এখানেও সেই অনিশ্চয়তার তত্ব। তাই প্রকৃতি বেশি করেই ডিম্বাণু মেয়েদের শরীরে দিয়েছে।' আমি ওর কথার সাথে কথা মিলিয়ে বললাম, 'ঠিক বলেছ শেখর, দেখো এক একজন পুরুষের প্রতি সহবাসে এক মিলিলিটার থেকে সাত মিলিলিটার বীর্য নিঃসরণ হয়। এক মিলিলিটার বীর্যে ১৫ মিলিয়ন থেকে ২০০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। অথচ একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত করতে একটি মাত্র শুক্রাণু প্রয়োজন। তাহলে একটি সহবাসেই কেন কোটি কোটি শুক্রাণু ঢেলে দেওয়া? প্রকৃতি বা ভগবান প্রতি সহবাসে একটি মাত্র শুক্রাণু দিতে পারত, তা কিন্তু দেয়নি। একটি পুরুষের একবার সহবাসে যে শুক্রাণু নিঃসরণ হয় তা দিয়ে পৃথিবীর সকল গর্ভধারণক্ষম নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত হতে পারে। তোমার কথার সঙ্গে এটাও মিলে যাচ্ছে- সেই অনিশ্চয়তার তত্ব। প্রকৃতিও যেন অনিশ্চয়তায় ভোগে, তাই এত সতর্কতা।'

ডাঃ চক্রবর্তী গাড়ির মধ্যেই প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'এই তো দাদা, ঠিক ধরেছ। তোমার আর আমার দর্শন কি অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে। অনশ্চয়তাই পৃথিবীটাকে টেনে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এ পৃথিবী ধ্বংস হবে না কোনদিন।'

দূরে নারকোল গাছ দেখিয়ে বলল, 'দাদা দেখুন, এক একটি নারকোল গাছে এক এক বারে হাজারটা ফুল হয়। আর শেষমেশ নারকোল হয় কয়টা? বড়োজোর পঞ্চাশ বা একশোটা। পঞ্চাশটা ফুল হলেই তো পারত। অনিশ্চয়তা, বুঝলেন দাদা, অনিশ্চয়তা। প্রকৃতিরও ভয় কেউ যেন তার বুক থেকে হারিয়ে না যায়। তাই সব বেশি বেশি দেয়।' আমি প্রসঙ্গ টেনে বললাম, 'দেখো, মা যেমন ছেলে স্কুলে যাওয়ার সময় তার টিফিন বাক্সে ছেলে যে পরিমাণ খাবার খায় তার চেয়ে একটু বেশিই টিফিন দিয়ে দেয় তেমন প্রকৃতিও তার সন্তানের কথা ভেবে সবকিছু একটু বেশি বেশিই দেয়।'

'প্রকৃতিও তো মা'- ডাঃ চক্রবর্তী বলে চলে।

প্রেমেও সেই একই ব্যখ্যা। প্রেম যত গভীর হয় তত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। যে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই সেখানে প্রেম নেই, অতি সাধারণ সম্পর্ক সেখানে- তা সে স্বামী স্ত্রী হোক বা প্রেমিক প্রেমিকা বা সন্তান-বাবা মা হোক। প্রেমের ইন্ধনদাতা অনিশ্চয়তা। প্রেমের উৎসাহদাতা অনিশ্চয়তা। যতক্ষণ দুই প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাবনা থাকবে ততক্ষণই প্রেম থাকবে। ওদের মধ্যে যেদিন অনিশ্চয়তা থাকবে না সেদিন প্রেমও থাকবে না। ওরা সেদিন হয়ে উঠবে দুই ভোগসর্বস্ব নরনারী-শরীরবাদী দুই যৌনাশ্রয়ী প্রাণী। অথবা নিছক দুই সংসারী না হয় চিরবিরহী-বিচ্ছেদের পত্রে স্বাক্ষর করা দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ। সংসারীদের মধ্যে কাজ করে দায়িত্ববোধ। প্রেম সেখানে গৌণ।

ভোগ সর্বস্ব নরনারীদের মধ্যে শরীর নিয়ে ততটা অনিশ্চয়তা বিরাজ করে

না। ওরা জানে শরীর একটা না একটা মিলবে কোথাও। কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকা জানে, ও ছাড়া আমাকে আর কোন ভালোবাসার মানুষ জন্মই নেয়নি এ পৃথিবীতে। ওকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। তাই প্রেমে হারানোর ভয়, এটাই অনিশ্চয়তার টানাপড়েন, এখানেই প্রেমের গভীরতা ও সার্থকতা।

আমি একদিন দীপালীকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম আমার লব্ধ বিশ্লেষণ। ও বলে উঠল, 'কি বললে? সংসারী মানে প্রেমহীন? প্রেম আলবাত থাকে। ওটা তোমার বা তোমাদের পুরুষজাতের বোঝার ভুল। প্রেমও থাকে ভালোবাসাও থাকে।'

আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'দেখ, প্রেম আর ভালোবাসার মধ্যে একটা পার্থক্য বা রেখা টানতে চাইছি আমি। আমি নরনারীর প্রেম বোঝাতে চাইছি। এ প্রেম যত গভীর হবে অনিশ্চয়তা তত প্রবল হবে। আর সংসারে দুই নরনারীর প্রেমের স্থান দখল করে ভালোবাসা। ভালোবাসা যত গভীর হবে অনিশ্চয়তা তত কমবে। ভালোবাসা স্বামী স্ত্রী, বাবা মেয়ে বা ছেলে, বউমা শ্বশুর শাশুড়ি সকলের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রগাঢ় হয়, একটা স্থায়ীত্বের রূপ নেয়।' দীপালী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যা, এবার তোমার ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হলাম। আমিও এটাই বোঝাতে চাইছি।'

আমি ওকে বঝালাম, 'ভালোবাসা হচ্ছে প্রেমের পূর্ণতার শেষ ধাপ। প্রেম অস্থির-অনিশ্চয়তার আধার, আর ভালোবাসা স্থির ও পরিপূর্ণ।'

আমি বললাম, 'প্রেম দুটি ক্ষেত্রে সঠিক রূপ নেয়—

দুইটি নরনারীর মধ্যে আর মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে। আর এই দুটি ক্ষেত্রেই থাকে গভীর আকর্ষণ সে জন্যই সৃষ্টি হয় ততোধিক অনিশ্চয়তা। যে যত বেশি ঈশ্বরের আরাধনা করে সে তত বেশি ঈশ্বরকে পেতে ব্যাকুল হয় আর ততই বিক্রিয়া করে অনিশ্চয়তা এবং তত মগ্ন হয় ঈশ্বরের সাধনায়- ঈশ্বরের প্রেমে। সবকিছু ত্যাগ করতে পারে ঈশ্বরের প্রেমে- ঈশ্বর সাধনায়। ঘর সংসার সম্পত্তি সম্মান-সবই।

দুটি নরনারীর ক্ষেত্রেই একই ব্যাকুলতা। আমি দীপালীকে বললাম, 'দেখ, আমার আবার ভুল ব্যাখ্যা করো না। ঈশ্বরের প্রেম অর্থ সারা দিন চোখ বুঁজে তপস্যা করা বোঝাইনি। ঈশ্বরের প্রেম অর্থ জীবে প্রেম, মানুষের উপকার, জনসেবা, অনাথের পাশে থাকা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং তপস্যা- সব কিছু। যার যা পথ। যার যা মত।'

মানুষ ইন্সিওরেন্স কেন করে? উত্তর একটাই, অনিশ্চয়তা আর ঝুঁকি। ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট বাড়িতে এসে কি বলে? বলে, 'আপনার জীবনের কি নিশ্চয়তা আছে যে আপনার জীবনে কোন ঝুঁকি নেই? আপনার সব কিছুই অনিশ্চিত- যে কোন সময় একটা বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আপনার জীবনে।

এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' আর সেজন্য মানুষ পয়সা খরচ করে ঝুঁকি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করে। স্বাস্থ্যবিমা করে, জীবনবিমা করে, বছর বছর প্রিমিয়াম গোনে আর অনিশ্চয়তার সামাল দেয় পয়সা দিয়ে।

এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশেই করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত, কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছে ইতিমধ্যে। চারিদিকে মৃত্যু মিছিল। বিভিন্ন দেশে অনেক চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছে ও মারা গেছে করোনা আক্রান্তদের সেবা প্রদান করতে গিয়ে। দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষ কর্মচ্যুত। অনাহারে অর্ধাহারে চারিদিকে হাহাকার। ইতিমধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতি ধুঁকছে। আগামিতে কি হতে চলেছে ভেবে এক মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে পৃথিবীর মানুষ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অনিশ্চয়তায় , কি ভাবে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচানো যাবে। কোন প্রতিষেধক বের করা যাবে কিনা- চিকিৎসা বের করা যাবে কিনা। কতদিন আর মানুষকে এভাবে ঘরে লকডাউন করে আটকে রাখা যাবে। এক অনিশ্চয়তায় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, তথা পৃথিবীর সকল মানুষ।

অনিশ্চয়তার অর্থই ঝুঁকি। হারানোর ঝুঁকি। কিছু হারানোর ঝুঁকিই মানুষকে এগিয়ে দেয় সামনের দিকে। যে মানুষ হারানোর ঝুঁকি মানে না বা বোঝে না তার অনুভূতি কম, কেউ কেউ বলেন এদের বুদ্ধিই কম। যার যত বুদ্ধি বা মননশীলতা বেশি তারই হারানোর তাড়না বেশি। হারানোর তাড়না মানুষকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে। অনিশ্চয়তা সব সময় মনের মধ্যে একটা সতর্কতার প্রবণতা সৃষ্টি করে রাখে। এটাই জীবন চলার ক্ষেত্রে অনুঘটক। এরা ঝুঁকির কারণগুলোকে এক দুই তিন করে লিপিবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করে। আর প্রতিটি ঝুঁকিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে সচেষ্ট থাকে সর্বদা। এরা জীবন চলার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রগুলোকে তালিকাবদ্ধ করে আর সেই অনিশ্চয়তার দ্বারা সৃষ্ট ফাঁক ফোকরগুলোকে মেরামত করার চিন্তা করে অবিরত। এদের জীবন ক্ষত বিক্ষত কম হয়। যে মানুষ যত বুদ্ধিমান তার অনিশ্চয়তার তালিকা তত বড়ো। তার রক্ষণব্যূহ তত শক্ত। যার অনিশ্চয়তার তালিকা যত ছোটো তার জীবন তত নড়বড়ে। ততই বিপদসঙ্কুল।

এই যে বর্তমানে করোনা ভাইরাস আক্রমণে পৃথিবীর উপর নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্যোগ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং দেশের উচ্চ পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে-

-সকলে মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন, ঘনঘন হাত ধোবেন

-হাত না ধুয়ে চোখে মুখে বা নাকে হাত দেবেন না।

এক শ্রেণির মানুষ কঠোর ভাবে নির্দেশিকা মেনে চলছে। এক শ্রেণির মানুষ চূড়ান্ত উদাসীন। বেপরোয়া মনোভাব। যেন কিছুই হয়নি, কিছু হবে না। এক

শ্রেণির মানুষ চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কি হবে ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না। সংসার কি ভাবে চলবে, মানুষ কি ভাবে বাঁচবে, এ সব। করোনা আক্রমণ যেমন মানুষের মধ্যে এক চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে সকলের মধ্যে। সকল মানুষ, সকল প্রতিষ্ঠান, সকল দেশ তাদের আগামি সকল পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়ের বিয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারছে না, ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অনুষ্ঠান করতে পারছে না বলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের চরম অনিশ্চয়তা। ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রীদের নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে মোবাইলে অনলাইনে পড়ানো হচ্ছে। ভবিষ্যৎ পড়াশোনার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারছে না অভিভাবক ও শিক্ষকেরা, অনিশ্চয়তায় সকলে। রাজ্যের নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সাহস পাচ্ছে না সরকার। সব বন্ধ রেখে শুধু করোনা প্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত। সেটাও সঠিক ভাবে করতে পারছে না । সকল পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ সকলের সম্মুখে পর্বতের মত দাঁড়িয়ে আছে অনিশ্চিত। কেউ বলে দিতে পারছে না- কোন পথে মুক্তি।

অনিশ্চয়তা এক অদ্ভুত অযাচিত অতিথি। যার যার নিজের ধরণে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। অনিশ্চয়তা যার যার নিজের একান্ত সম্পত্তি। এই সম্পত্তিকে যে যেমন ভাবে ব্যবহার করবে তার ভবিষ্যৎ সে দিকে এগোবে। যে যত অনিশ্চয়তাকে বুঝতে পারে তার বিপদ তত কম। কেউ তার কোন অনিশ্চয়তার কথা অন্য কাউকে শোনাতে গেলে তাকে উপহাস করতে দেখা যায়। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'কারো অনিশ্চয়তার ভাবনা তার নিজের প্রতিরক্ষার ভাবনা, সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করার মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র।' আবার এটাও স্বীকার করছি- তাই বলে মাত্রাতিরিক্ত ভাবনা বা দুর্ভাবনা মোটেই ভালো নয়। সেটা নিজের কর্মক্ষমতা কমিয়ে করে দেবে, গতি রুদ্ধ করে দেবে। বলা হয়ে থাকে, 'ব্যালান্স বা ভারসাম্য।' ভারসাম্য রেখে চলা, অনিশ্চয়তা, ভাবনা এবং প্রস্তুতি এই তিনের ভারসাম্য বা ব্যালান্স জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে চলবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তি আবার স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি মনে কর আজ সারাদিন কোন সমস্যার সম্মুখীন হওনি তাহলে বুঝবে আজ তুমি সঠিক পথে ছিলে না।' তিনি কতখানি প্রখর বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী ছিলেন তার এই উক্তিই বুঝিয়ে দেয়। আমি বুঝেছি, 'বাস্তবতার নিরীক্ষা আর যুক্তি এই দুইয়ের সঠিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ উদ্ভাবন করে জীবনের সম্ভাবনা।' অনিশ্চয়তাই সমস্যাকে চিনিয়ে দেয়, অনিশ্চয়তাই জীবনকে চিনতে সাহায্য করে।' মানুষের স্বরূপ জানা যায় মানুষের সংকটে ও অনিশ্চয়তায়। একমাত্র বাস্তব যে পৃথিবীর কোন মানুষই তার সামনের দিনের কোন ঘটনা বা পথ

স্পষ্ট, নির্দিষ্ট এবং রহস্যহীনভাবে দেখতে পারে না। জীবন সম্মুখে এগোয় অস্পষ্টতা, অনির্দিষ্টতা ও রহস্যময়তাকে সঙ্গী করে। মানুষের জীবন হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো রহস্য উপন্যাস।

সবই যদি পরিপাটি মসৃণ হত তাহলে সেটা জীবন হত না। চড়াই উৎরাই আছে বলেই জীবন এত মধুর, জীবন এত উপভোগ্য, জীবন এত সুন্দর।

Uncertainty is the lack of certainty, a state of limited knowledge where it is impossible to exactly describe the existing state, a future outcome, or more than one possible outcome.

If it is unknown whether or not it will rain tomorrow, then there is a state of uncertainty. If probabilities are applied to the possible outcomes using weather forecasts or even just a calibrated probability assessment, the uncertainty has been quantified.

Most would be willing to pay a premium to avoid the loss. An insurance company, for example, would compute an expected opportunity loss, as a minimum for any insurance coverage, then add onto that other operating costs and profit. Since many people are willing to buy insurance for many reasons, then clearly the expected opportunity loss alone is not the perceived value of avoiding the risk.

Quantitative uses of the terms uncertainty and risk are fairly consistent from fields such as probability theory, science, and information theory. Some also create new terms without substantially changing the definitions of uncertainty or risk. For example, surprisal is a variation on uncertainty sometimes used in information theory. But outside of the more mathematical uses of the term, usage may vary widely. In cognitive psychology, uncertainty can be real, or just a matter of perception, such as expectations, threats, etc.

Vagueness is a form of uncertainty. Ambiguity is a form of uncertainty where even the possible outcomes have unclear meanings and interpretations. Ambiguity typically arises in situations where multiple analysts or observers have different interpretations of the same statements.

Uncertainty may be a consequence of a lack of knowledge of obtainable facts. That is, there may be uncertainty about whether a new rocket design will work, but this uncertainty can be removed with further analysis and experimentation.

Uncertainty may be a fundamental and unavoidable property of

the universe. Uncertainty puts limits on how much an observer can ever know about the position and velocity of a possibility. This may not just be ignorance of potentially obtainable facts but that there is no fact to be found.

Measurement of uncertainty: A set of possible states or outcomes where probabilities are assigned to each possible state or outcome - this also includes the application of a probability density function to continuous variables.

Second order uncertainty is represented in probabilities. A state of uncertainty has some possible outcomes and virtual positive outcome.

সমাপ্ত

References

1. Cacioppo, J.T & Gardner, W.L (1999). Emotion.
2. Islam: A Short History, Karen Armstrong
3. Schacter, D.L., Gilbert, D.T., Wegner, D.M.- Psychology
4. Schwarz, N.H. (1990). Informational and motivational functions of affective states.
5. Happiness:Wolfram Alpha.
6. Feldman, Fred (2010). What is This Thing Called Happiness?
7. Summa Theologica: What is Happiness
8. Masman, Karen (21 July 2010). The Uses of Sadness: Why Feeling Sad is No Reason Not to be Happy.
9. Skynner, Robin; Cleese, John (1994). Families and How to Survive Them.
10. Anger.- Gale Encyclopedia of Psychology, Stein, Abby
11. Cupid's Knife: Women's Anger and Agency in Violent Relationships. Burkeman (2006).
12. Anger Management - . The Guardian
13. Buss, D.M. (2000). The Dangerous Passion: Why Jealousy is as Necessary as Love and Sex
14. Gleiberman, Owen (2002-05-17).. Entertainment Weekly.
15. Ebert, Roger. Unfaithful–Chicago Sun-Times.
16. David Sundgren and Alexander Karlsson. Uncertainty levels of second-order probability. Polibits,
17. Audun Josang. Subjective Logic: A Formalism for Reasoning Under Uncertainty.Springer, Heidelberg, 2016
18. Batson, C. D., 1991, The Altruism Question, Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, part III.
19. শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা।